নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা

বিনয় ঘোষ

নূতন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা

প্রকাশক—অনিল ঘোষ
নূতন সাহিত্য ভবন
৫৭/২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৪০

দাম চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ
পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৪৭, মধুরায় লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্বীকৃতি

প্রথমে এই পুস্তকের ‘বাংলা সমালোচনা’ নামক অধ্যায়টির জন্যে আমার ঋণ স্বীকার করা উচিত শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস-এর কাছে। প্রাচীন বাংলা সমালোচনার অনেক-গুলি ‘উদাহরণ’ তিনি আমার জন্যে সযত্নে সংগ্রহ কোরে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা কোরেও আমি উপকৃত হয়েছি, এবং কোনো কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও আমার ক্ষতি হয়নি। এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ রইলাম।

‘নূতন সাহিত্য’, ‘নূতন সমা-লোচনা’ এবং ‘সাহিত্য ও প্রোপা-গ্যাণ্ডা’ শীর্ষক অধ্যায়গুলি ‘শনিবারের চিঠি,’ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ এবং পাটনার ‘প্রভাতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের মধ্যে সেই প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

এই সঙ্কটের দিনে এই পুস্তক প্রকাশের কাজে যেসব সহকর্ম্মীরা ও বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতার আশা ও দাবি রাখি।

প্রচ্ছদপট

এই বইয়ের প্রচ্ছদপটে যে ভাবটিকে শিল্পী রূপায়িত করেছেন, সেটি হোচ্ছে মধ্যযুগ থেকে যন্ত্র-যুগের আবির্ভাবের ভাব। মন্দির, স্তম্ভ, লাঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় পল্লী-সংস্কৃতির ‘প্রতীক’গুলির সঙ্গে বৃহত্তর যন্ত্র-মূর্ত্তিটি সংযোজনের অর্থ হোলো এক যুগের ঐতিহাসিক অবসানে আর এক নূতন যুগের অভ্যুদয়। সবকিছুর পিছনে মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম রয়েছে বোলে যন্ত্রের মূর্ত্তিটির ভিতর থেকে মুষ্টিবদ্ধ একটি মানুষের আকৃতিও চোখে ভেসে ওঠে। পটভূমিকায় নবারুণের আভাষও ইঙ্গিতময়। যন্ত্রযুগ তার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলিত অবস্থা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের মধ্যে যন্ত্র ও মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত জানাচ্ছে। বর্ত্তমানে এ-দেশের পূর্ণরূপটি ছবির মধ্যে ফোটাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পী ছবির টেক্‌নিক্‌টি ধার করেছেন কিউবিজম্‌-এর সূত্র থেকে, বিশেষ কোরে যন্ত্র-মূর্ত্তিটি শিল্পী পিকাসোর অনুকরণ বলা চলে। শিল্পীর বর্ত্তমান প্রচেষ্টায় এই অনুকরণ স্বাভাবিক না হোলেও, বোধ হয় অমার্জ্জনীয় নয়।

সূচী

ভূমিকা

প্রারম্ভে অপ্রিয় কর্ত্তব্যটুকু শেষ করা উচিত। গত মে মাসে আমার "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" নামক পুস্তকের 'প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হবার পর মাত্র কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাঙলাদেশে ও বাঙলার বাইরে বইটি সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকাতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তাতে আমি যথেষ্ট অবাক হয়েছি। মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও সমালোচকেরা বইখানিকে যে এমন আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন আমি কল্পনাও করিনি। সাহিত্যক্ষেত্রে যে গোষ্ঠীগঠন চলেছে, তা পৃথিবী-ব্যাপী প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির যে দ্রুত নিজ নিজ স্থান-নির্ণয় চলেছে, তারই অনুরূপ। রাজনীতিতে যে-দলাদলি, সাহিত্যেও তাই। এ-দলাদলি অবাঞ্ছনীয় হোলেও অনিবার্য্য। তাই আজ একেবারে নিরপেক্ষতার দাবী করা কোনো সচেতন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, যদিও নিরপেক্ষ সমালোচনার ক্ষেত্রের প্রসার বৃহত্তম। আমার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার সামান্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এ শিষ্টতা-প্রকাশ নয়, সরল স্বীকৃতি। আজ যে-জীবন-দর্শনে আন্তরিক বিশ্বাস করি তারই আলোকে জীবনের অন্যান্য শাখাপ্রশাখাগুলিকে বিচার করবার চেষ্টা করি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছু। কিন্তু যেদেশে কোনো গোঁড়া ব্রাহ্মণ বা মৌলবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁকাল উপাধির জোরে এখনো সংস্কৃতির রাজসিংহাসন দখল কোরে আছেন, সেখানে সত্যকার সাম্যবাদী দর্শনের যে স্থান কোথায় হোতে পারে তা বুঝতে দেরী হয় না। এই কারণে উক্ত বইয়ের অকপট অভ্যর্থনায় আজ সত্যই বিস্মিত হবার কথা। এই দর্শনের মূলমন্ত্র যেসব কর্ম্মী অম্লান সহিষ্ণুতার সহিত এ-দেশের জনগণমনে অনুরণিত করবার জন্যে প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতাই অবশ্য আমার শ্রেষ্ঠ সম্বল এবং নূতন

সাহিত্যিকের জীবনের উপজীব্য। তাঁদেরই কথাকে শ্রদ্ধা করতে হয়ে সবচেয়ে বেশী, কারণ তাঁদের দৈনন্দিন কর্ম্মে ও জীবনে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য রয়েছে। তবু অপ্রত্যাশিত যে সমাদর বইখানা সকলের কাছ থেকে পেয়েছে তা এদিনে অন্তত উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু শত্রুশূন্য দেশ তো এখনো হয়নি, তাই বিদেশী অভিভাবকদের বেতনভোগী দেশী শৃঙ্খলারক্ষকেরা যখন জুজুর ভয়ে (যদিও উক্ত বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল শিল্প ও সাহিত্য) বইগুলি নিজেদের গোপন পাঠাগারে স্থানান্তরিত করলেন, তখন স্বদেশের 'পঞ্চম বাহিনীও' সচেতন হোলেন। বলা বাহুল্য, এই 'পঞ্চম বাহিনী' আমাদের বাঙলাদেশের নিষ্কাম 'জ্ঞান-চাতকের' দল। 'স্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রিকায় বইখানি সম্বন্ধে "courageous," "ambitious" এবং "praise-worthy" প্রচেষ্টা বোলে এই উপদেশ তাঁরা আমাকে দিলেন যে যাঁরা ইংরেজী বই পড়েন তাঁদরে জন্যে এ-বই না লেখাই উচিত ছিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হালফ্যাশানের 'সোশ্যালিজম্‌'-এর গাল্‌চে-বিছানো ড্রয়িংরুমে লণ্ডন থেকে আমদানি প্রুফ্রক্‌-সুইনি-ডোরিসের চুচুক্তি যে-"চতুরঙ্গ"-এ ধ্বনিত হয় তারই পৃষ্ঠায় দেখা গেল 'স্টেটস্‌ম্যান্‌'-এর প্রতিধ্বনি। বুঝলাম সবটাই 'লর্ড সিন্‌হা রোডের' প্রতিধ্বনি, এবং তার প্রাঞ্জল অর্থ হোলো এই যে ইংরেজীতে যা আছে থাক, তাকে সহজবোধ্য কোরে বাঙলা ভাষায় লিখে পাঠকের কাছে পরিবেশন করা অন্যায়। কিন্তু যখন কোরে ফেলেছি, এবং নিজের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত কোরে বাঙলা ভাষায়, তখন তাঁরা আমাকে পরোক্ষে 'কুম্ভিলক' বোলে, দুর্ব্বোধ্যতা ও পণ্ডিতিয়ানার অপবাদ দিতে কার্পণ্য করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শাসিয়েও দিলেন যে এর মধ্যে 'মৌলিকত্ব' কিছু নেই।

স্বীকার করছি আমি যে আমার 'মৌলিকত্ব' নেই, মৌলিকত্বের দাবীও আমি করিনি, বিশেষ কোরে 'মৌলিকত্ব' বিচারের জন্যে অন্তত তাঁদের কাছে কোনোদিনই আমি উপস্থিত হব না যাঁরা 'বাঁদরের টেব্‌ল ভক্ষণ', 'নারীর মস্তিষ্ক-প্রসূত পুত্র', 'ইয়েটস্‌ ও কলাকৈবল্য', 'হপকিন্‌সের স্প্রাং-রিদম্‌', 'ওফেলিয়া', 'কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স্‌', 'ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি, ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে ডলুই নিজে—এমন কি

সেই আঁচিলটা—তা-ও', 'দেবুতাঁৎ', 'কামারাদেরি', এটাকৃসিয়া', 'টপ্পা-ঠুংরি', 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম, নারীধর্ষণের ইতিহাস' প্রভৃতি রচনা কোরে বাজারে 'মৌলিক' হয়েছেন। যেদিন এঁদের 'মৌলিকত্বে'র বিচারক বোলে স্বীকার করবার মতো মানসিক বিকৃতি ঘটবে সেদিন আমি ও আমার সহকর্মীরা কলম বন্ধক দিয়ে স্টক্ এক্সচেঞ্জে ঘুরব, তার আগে চেষ্টা করব মৌলিকত্বের ছদ্মবেশে এঁরা যে 'মন্‌কি-ত্ব' করছেন, বাঙলাদেশের পাঠকদের কাছে তাকে অনাবৃত করতে। কথাপ্রসঙ্গে 'মৌলিকত্ব' সম্বন্ধে একজন খ্যাতনামা আধুনিক সাহিত্যিক ও সমালোচকের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন:

> I am not interested in originality, but in trying to be *sound* and *truthful.* Originality in thought anyway, does not come from any sudden great inspiration *picked out of nowhere*; it comes from working with what is found to be sound, and *organising* and *extending* that knowledge.
>
> (James T. Farrell—A Note on Literary Criticism—P. 177, Footnote. Italics আমার)।

'মৌলিকত্ব' সম্বন্ধে এই হোলো আমারও বক্তব্য, এবং "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" নামক পুস্তকে যখন মার্কসীয় দর্শনের সাহায্যে সাহিত্য-সমালোচনা করেছি, তখন সত্যকার সমালোচকের মতো, ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায়, আমিও তার মধ্যে চেষ্টা করেছি "to *propagate* the best that is known and thought in the world", অন্তত মার্কসীয় চিন্তার জগতে। সেইজন্য সেখানে যেমন ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল্ তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থান পেয়েছেন, র‍্যালফ্ ফক্‌স্, কর্নফোর্ড, ফ্যারেল্, হিকস্, স্পেণ্ডার, গোর্কি, রোলাঁ, এবং এঁদের সকলেরই পথপ্রদর্শক মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন্‌ও যোগ্য আসন দখল করেছেন।

ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্যে উক্ত পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল না বোলে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকগোষ্ঠীর "পঞ্চম বাহিনী"-ভুক্ত সাহিত্য-সমালোচকেরা আমাকে মূলগ্রন্থ অনুবাদের যে হিতোপদেশ দিয়েছেন,

তার মধ্যে 'চোখরাঙানিই' স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ বৈদেশিক পত্রিকায় কড্‌ওয়েল্‌-এর "Illusion and Reality"-র সমালোচনা পড়ে' যাঁরা অনুবাদের আদেশ দিয়েছেন, তাঁরা আসল বইখানা মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারতেন যে 'বর্ত্তমানে' কড্‌ওয়েল্‌-এর বই বাঙলায় তর্জ্জমা করা পাগলামি ও অর্থহীন। 'কাব্য' ও একমাত্র তারই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির মার্কসীয় পদ্ধতিতে গভীর ও জটিল দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেকেই বুঝতে চাইবেন না। আমার বইয়ের বিষয়গুলি নানারকমের ছিল, শুধু 'কাব্য' বা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিল না। 'ডায়েলেক্‌টিকস্‌' থেকে আরম্ভ কোরে মার্কসীয় শিল্প-দর্শন, কাব্য-উপন্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আধুনিক সংস্কৃতি সঙ্কট, মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা কোরে আমি যে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, শুধু কড্‌ওয়েল নয়, কোনো 'একজন' বৈদেশিক মার্কসীয় সমালোচকের গণ্ডীর মধ্যে তা পড়ে না। সমস্ত বিষয়গুলিকে সুসংবদ্ধ কোরে গ্রন্থিত কোরে দিয়েছিলাম বাঙালী পাঠকের কাছে দু'টি উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সত্যকার মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতটি দেখানো; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 'দালাল' ট্রেড্‌ ইউনিয়নিষ্টদের শ্রমিক আন্দোলন করার মতো বা জওহরলালজীর সখের সোশ্যালিজম্‌-এর বুলি আওড়ানোর মতো, সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙলাদেশে যেসব ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন, নিরালম্ব, পঙ্গু প্রজ্ঞা-প্রেমিক ও সাহিত্য-বিলাসীরা 'প্রগতি সাহিত্য' বা 'সোশ্যালিষ্ট সাহিত্যের' হ্রেষায় আকাশ বিদীর্ণ করছেন তাঁদেরই মুখোস খুলে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ওয়েলস্‌-হাক্স্‌লী-এলিয়ট্‌-পাউণ্ড প্রমুখ তাঁদের সমুদ্রপারের দীক্ষাগুরুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য কিছু সার্থক হয়েছে, কারণ মত-বিরোধিতা সত্ত্বেও সকলশ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছি। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সাফল্য এই 'ফ্যাশানেবল্‌', চটকদার 'প্রগতিবাদীদের' আতঙ্ক-জনিত উপদেশের মধ্যেই সূচিত হোচ্ছে, এবং এঁরা যে সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকগোষ্ঠীর "পঞ্চম বাহিনী" তাও প্রমাণিত হোচ্ছে। তবু একটা কথা এই ইংরেজী-শিক্ষিত 'পণ্ডিতদের' বলা উচিত। কথাটা

ম্যাক্সিম্ গোর্কির হোলেও এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বাধা নেই। য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ এবং সোভিয়েট্ বুদ্ধিজীবীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা কোরে গোর্কি বলেছেন ঃ

> The *foreign* and *internal* enemies will no doubt rejoice and say : 'Here is Gorky, too, giving us some enjoyable spiritual food !' But their rejoicing will be misguided. I have no intention of feeding pigs.
>
> (Maxim Gorki : Culture and the People. P. 198)

এ-দেশের বৈদেশিক শত্রুর কীর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, ঘরের শত্রুদের কথাও উল্লেখ করলাম। আমার মতো একজন অপরিচিত সামান্য লেখকের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সাম্যবাদী সমালোচনা করার প্রচেষ্টা দেখে 'ঘরের শত্রুরা' নিশ্চয়ই মুচ্‌কি হেসে আরামকেদারায় পাশ ফিরে বলবেন ঃ "এই আর একজন সাম্যবাদী,—আবার ইণ্টেলেক্‌চুয়াল—হাঃ হাঃ !" গোর্কির কথার পুনরুল্লেখ কোরে এই পণ্ডিত বিভীষণদের আমিও বলছি ঃ "*I have no intention of feeding pigs.*"

বইয়ের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এসেছে যে যাঁরা সভ্যতার ধ্বংসলীলা দেখে করুণ সুরে বিলাপ করছেন তাঁদের কেন 'বিপ্লবী' বলা হয়নি। বর্ত্তমানে চারিদিকে যে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার শীতল স্পর্শে শিল্পীর অন্তরের বীণার তারে বিলাপের রাগিণী ঝঙ্কৃত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এবং সত্যই যাঁরা তাঁদের বেদনা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন তাঁরা 'প্রগতিশীল' সকলেই স্বীকার করবেন, কারণ তাঁদের বর্ত্তমানের আবিলতার প্রতি অশ্রদ্ধা আছে, এবং সে-অনুভূতি নিবিড়। কিন্তু 'বিপ্লবী' তাঁরা নন, যেহেতু সত্যকার 'বিপ্লবীর' 'বিদ্রোহ'-টাই আসল নয়, সেই বিদ্রোহের পিছনে থাকে সুন্দরতরের তীব্র 'কামনা'। কার্ল মার্ক্‌স্ এইজন্যই বাইরনের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়াশীল বোলে, শেলীকে বলেছিলেন প্রকৃত 'বিপ্লবী' কবি, এবং ব্যাল্‌জাক্‌কে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন 'প্রগতিশীল'। বইতে যাঁদের 'প্রগতি-বিরোধী' বলা হয়েছিল তাঁরা শুধু বিলাপই করেন না,

মধ্যযুগের ধর্ম্মের নীড়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করেন, কেউ হতাশ হয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে অহম্-সচেতন হন। বিশুদ্ধ বা উদ্দেশ্যহীন 'বিদ্রোহের' বিপদ এইখানে, এবং এও মনে রাখা উচিত যে 'বিলাপ', 'অশ্রদ্ধা' বা 'গভীর বেদনা' আর 'বীভৎস নাকী মরণকান্না' এক নয়। 'বেদনা' বা 'বিলাপের' যদি গভীরতা থাকে, এবং সেই গভীরতা যদি শিল্পে রূপায়িত হয়ে ওঠে, তবে তাকে অস্বীকার করবে কে? কিন্তু 'মরণকান্না' যদি শ্মশানের শৃগাল কুকুরের শব কাড়াকাড়ির চীৎকার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চোখের সামনে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দেয় তাহোলে তাকে বীভৎস বোলে থামতে বলাই স্বাভাবিক নয় কি? তাই দুঃখ হয় যখন দেখি বাঙলাদেশের কোনো আধুনিক তরুণ কবি বলছেন: "In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, *the decayed side of things attracts us most.* The boredom and horror, rather than glory of life is our immediate reality."—এবং 'In defence of decadents' এই যুক্তি দিয়ে এইটাকেই এ-যুগের 'স্বাভাবিক' অনুভূতি ও চেতনা বোলে প্রচার কোরে নিজেকে ও নিজের দলভুক্তদের যুগাদর্শের 'প্রতীক' প্রতিপন্ন করছেন। এ-সম্বন্ধে 'বিপ্লবীর' বক্তব্য পূর্ব্বে "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" নামক পুস্তকের মধ্যেই বলেছি, এবং এই পুস্তকের মধ্যে 'বাংলা সমালোচনা' ও 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' নামক অধ্যায় দু'টিতে আরো স্পষ্টভাবে বলেছি। তবু উক্ত 'কবিরা' আমাদের কটু সমালোচনার জন্যে সাম্যবাদী সাহিত্যকে যে 'সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ' বোলে উপহাস করেছেন এবং "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো" বোলে তাঁদের দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার কোরে নিতে হুকুম করেছেন, তার খাঁটি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। উত্তরটা অবশ্য বহুপূর্ব্বে, ১৯২৯ সালে, ম্যাক্সিম্ গোর্কি তাঁর "On the Good Life" নামক একটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়েছিলেন। সেই উত্তরটাই এইখানে উদ্ধৃত করব এইজন্য যে, গোর্কি প্রবন্ধটি উত্তর হিসাবে সেইসব তরুণ লেখকদেরই লিখেছিলেন, যাঁরা "as a result of *limited understanding of culture* and a sense of irritation due to the buffets and pin-pricks of maladjusted conditions of life,—"

অবসাদে নিমজ্জিত হয়ে কেবল "ধূসর মৃত্যুর" বিভীষিকা দেখেন। গোর্কি বলেছেন :

> If young people start thinking that...they will have to exchange their place on earth for one under it,—"into the gloom and chill of the void" or "somewhere,"—as they write—it means that these fellows are leaving life already. And since life is jealous and is *no patron of loafers*, youngsters must not be offended if it bundles them into the debris of metaphysics by the scruff of the neck. Life, inspite of its outward deformities inflicted by the wrongdoings of men, is biologically healthy, full-blooded ; it requires the strong, the bold, and it sweeps self-abusers and word-abusers ruthlessly aside.

আশা করি এ-কথার মর্ম্ম বাঙলাদেশের 'decadent' কবিরা বুঝবেন, এবং "সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ" যাঁদের সম্বল তাঁরা, অর্থাৎ আমরা যদি তাঁদের হাড়সার, বিবর্ণ কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান কোরে, '*life is jealous and is no patron of loafers*' বোলে কটূক্তি করি তাহোলে তাঁরা ক্ষুব্ধ বা "offended" হবেন না।

এইবার কয়েকটি নিজের কথা বলি এই বই সম্পর্কে।

"নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা" যে আজকার যুগের দাবী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যুগের আহ্বানে নির্ভয়ে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হওয়াই সাম্যবাদীর কর্ত্তব্য। এই বইয়ে সেই কর্ত্তব্যই পালন করেছি। ত্রুটি যা ঘটেছে তা ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার জন্যে হয়তো, আদর্শের জন্যে নয়।

নূতন সাহিত্যের ভিত্তিও মানবতা হবে, কিন্তু সে-মানবতা আর ধনিকগোষ্ঠীর বদান্যতা এক নয়। নূতন সমাজ গঠনের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের 'মানবতা' ঘৃণা বিদ্বেষ, ভালবাসা সহানুভূতি সংমিশ্রিত। সুতরাং নূতন সাহিত্যের 'মানবতা'ও তাই হবে, এবং তার মধ্যে ধ্বনিত হবে প্রাণের সুর, স্পন্দিত হবে সুন্দরতর ও মহত্তর জীবনের আবেগ, কারণ মানব-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অবদান "প্রাণশক্তি", "জীবনের স্ফূর্ত্তি",—মৃত্যুর মালিন্য, অবসাদের ধূসরতা বা ধ্বংসের সর্ব্বশেষ আর্ত্তনাদ নয়। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার

মন্ত্র ও নূতন জীবনের উদ্বোধনী বাণী নূতন সাহিত্যিকেরা অর্থাৎ সাম্যবাদী সাহিত্যিকেরা প্রচার করবেন, এবং তা মহৎ সাহিত্যও হবে, প্রোপাগ্যাণ্ডা হবে না, যদিও "সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডার" মধ্যে পার্থক্য আছে। উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য আর দেহহীন জীব সমান অর্থহীন, যদিও উদ্দেশ্য সাহিত্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করবে, অতিক্রম কোরে 'লীড্' দেবে না। এই বইয়ে "নূতন সাহিত্য", "চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক," "সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা" নামক অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি আলোচনা করেছি। এর সঙ্গে "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা" নামক অধ্যায়টি পড়া চলতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ বা মূল যাঁরা বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মিকতার কন্দরে অনুসন্ধান করেন, এবং তারই মহিমায় বিভোর হয়ে সোশ্যালিষ্ট-কম্যুনিষ্ট আদর্শকে দূর থেকে অভিসম্পাত দেন, তাঁদের উত্তর "ভারতীয় সংস্কৃতির বেদী" নামক অধ্যায়ের মধ্যে প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে দেবার চেষ্টা করেছি। সেখানে তাঁরা দেখবেন সেই অনার্য্যদের জীবনের আদর্শ আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি, যদিও আর্য্য, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজের যুগে তার অবনতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে, যেমন ঘটেছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সমাজ ও সভ্যতার ক্রমাবর্ত্তনে আদিম সঙ্ঘসমাজ থেকে ধনিকসমাজের আবির্ভাব ও প্রসারের মধ্যে। সেই অনার্য্যের আদর্শের কঙ্কাল বহুযুগের রক্তে মাংসে বর্দ্ধিত হয়ে, নূতন লাবণ্যে, সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে আজ সাম্যবাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মানুষ তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

বইয়ের মধ্যে নূতন সমালোচনা বা মার্কসীয় সমালোচনার পদ্ধতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা কোরে বাংলা সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা করেছি "নূতন সমালোচনা" ও "বাংলা সমালোচনা" নামক অধ্যায় ছু'টিতে। প্রাচীন-পন্থী ও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন যাঁরা তাঁদের পছন্দসই না হোলেও এই নূতন ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক সমালোচনাও এ-যুগের দাবীর মধ্যেই গণ্য হবে, এবং সেইজন্যই বরেণ্য। বাঙলাদেশে আজও যেসব সমালোচক সংস্কৃত রসশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি প্রয়োগ কোরে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের একচেটিয়াত্ব দাবী করেন, তাঁরা এই নূতন সমালোচনা সরাসরি বর্জ্জন করবেন জানি। তাঁদের সে-অবজ্ঞাতে আমরা

আপত্তি করব না, কিন্তু আস্ফালনে আপত্তি আছে ঘোরতর। যেমন সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "আধুনিক বাংলা কাব্য" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে ঐ একই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে, হীরেন বাবুর প্রবন্ধ সরাসরি বর্জ্জনীয়। উত্তম সিদ্ধান্ত এবং এই পর্য্যন্তে আমাদের আপত্তি ছিল না, তবে হীরেনবাবুর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করলে উপকৃত হোতাম। কিন্তু অতুলবাবু পরেই বলেছেন যে যেহেতু হীরেনবাবু গণআন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামান, অতএব কাব্য বিচারের গৌরবার্জ্জনে (পুণ্য নয় কি?) তাঁর বাধা আছে। কদর্য্য উক্তি। কারণ অতুলবাবুর পাণ্ডিত্যে ও রসজ্ঞানে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাই এই হঠোক্তি আমাদের গর্ব্বোদ্ধত উক্তিও মনে হয়েছে। এখানে সমাদর্শীর জন্যে আমি ওকালতি করছি নে, কারণ ভুল দেখাবার বা বর্জ্জন করবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু তিনি যে-কারণে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে এমন নিষ্ঠুরভাবে একঘরে করলেন, তাতে তিনি না স্বীকার করলেও, এবং আমাদেরও স্বীকার করবার ইচ্ছা না থাকলেও, সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক, সমালোচনা ও সমালোচক সম্বন্ধে তাঁর শোচনীয় অজ্ঞতাই প্রমাণিত হোলো। ক্রিস্টেফার কড্‌ওয়েল্‌, র‍্যালফ্ ফক্‌স্‌, টি. কর্ণফোর্ড এঁদের নাম আজ কোনো শিক্ষিত লোকের অজানা নেই। এঁরা সকলেই ইংল্যণ্ডের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক, এবং শুধু গণআন্দোলন নয়, স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে এঁরা সকলে জনগণের পক্ষে সংগ্রাম কোরে সৈনিকের মতো মৃত্যুকে বরণ করেছেন। এ-যুগের পুরোগামী সাম্যবাদী সাহিত্যিক ও সমালোচকের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সাহিত্য-রসিকের পার্থক্য এইখানে। সোভিয়েট রুষিয়ার দৃষ্টান্ত এখানে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর্নস্ট্ টলার আজ অপরিচিত নন। টলার বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো শক্তিমান শিল্পী পৃথিবীতে ক'জন আছেন? অতুলবাবু জানুন, আরামকেদারায় তাম্রকূট সেবন করলেই যেমন কাব্য-রসিক হবার জন্মগত দাবী জন্মায় না, তেমনি গণআন্দোলনেও কাব্যবিচারের অধিকার ব্যাহত হয় না। হয়তো তিনি সবকিছুই জানেন, এবং কাব্য বা সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগের সাংস্কৃতিক মনোভাবই এই হঠোক্তির কারণ।

নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা

ভূমিকায় একথা উল্লেখ করতে বাধ্য হোলাম কারণ আমার এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। পাঠক বই পড়লেই বুঝতে পারবেন।

শেষে সহকর্ম্মীদের ও পাঠকদের কাছে আমার আর একটি কথা বলবার আছে। আলোচনাপ্রসঙ্গে বইয়ের মধ্যে কোথাও কোথাও আমার উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ কোরে যেখানে মতামতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে হয়েছে সেখানে। শান্তধীর সমালোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে সজ্ঞান থেকেও মধ্যে মধ্যে উগ্র হোতে বাধ্য হয়েছি, উগ্র হবার কারণটি উগ্রতর বোলে। মূল বক্তব্য বিষয়টিতে অবশ্য সর্ব্বত্রই মনোযোগ দিয়েছি বেশী।

৭ই নভেম্বর, ১৯৪০
কলিকাতা

বিনয় ঘোষ

Without work, without struggle, a book-knowledge of Communism obtained from Communist books and works would be worthless, for it would continue the old separation of theory from practice, the old separation that was the most disgusting feature of the old bourgeois society.

—*V. I. Lenin.*

For all my life my only heroes have been those who enjoy work and are able to work, those whose aim it is to liberate all the forces of humanity for creative work, in order to make our world more beautiful and to organise forms of life on earth that are worthy of mankind.

—*Maxim Gorki.*

My activities have always and in every case been dynamic. I have always written for those *who are on the move.* I have always been on the move, and I hope never to stop as long as I live. Life will be nothing to me if it is not movement—straight ahead, of course! And that is why I am with the peoples and classes who are marking out its course for the river of humanity, with the masses of the organised proletarian workers and their Union of Socialist Soviet Republics.

—*Romain Rolland.*

নূতন সাহিত্য

মানুষ কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইথারের ভিতর দিয়ে কোনো অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না, অনাদি অনন্তকাল ধরে' ইতিহাসের ঊর্ধ্বে যে-মূর্ত্তি চিরবিরাজমান, বিমূর্ত্ত সে-মানুষ আমাদের কল্পনার বাইরে। অনৈতিহাসিক, অবিনশ্বরতা ও শাশ্বতের ছায়াতলবাসী সে-মানুষের অদ্ভুত মূর্ত্তি আমাদের ধারণাতীত। আমাদের 'মানুষ' ঐতিহাসিক, সভ্যতার কঙ্কালের প্রত্যেকখানি পাঁজর যে নিজের হাতে গড়েছে, বিচিত্র আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উদ্দীপনায়, আবেগে, যে তাতে রক্তমাংস দিয়ে জীবন্ত কোরে এই বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। মানুষের কথা মনে হোলে তাই ইতিহাসের অন্দরমহলের কপাট সব একে একে খুলে যায়, দেখি, যূথচারী মানুষ মরু প্রান্তর পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে আহার অন্বেষণে, প্রকৃতি যেখানে সদয়া হন, যাযাবর জীবনে সেখানে এক একটি ছেদ পড়ে, তারপর এই মানুষই ক্রীতদাস হয়, সামন্তপ্রভু হয়, শ্রমিক হয়, ধনিক হয়, বণিক হয়, আর ওদিকে তার তীর-ধনুক, পাথর, লোহা ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎচালিত বিশাল দানবীয় যন্ত্রে পরিণত হয়। রাজার কবর ছেড়ে এই মানুষের স্থপতিশিল্পই কলিকাতা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম, বার্লিন সহর গড়ে ; মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায় তার চিহ্ন র'য়ে যায়। এই মানুষেরই মুখে মুখে রচিত আদিম অর্থহীন যৌথসঙ্গীত দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে, মানুষের উদ্দেশ্যে ছন্দে ও অর্থে, সজীবতায় ও শব্দসুষমায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এই যে মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস, এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ক্লেদ ও মালিন্য, কিন্তু সেই মালিন্যকে জয় করেছে প্রাণের আলো, জীবনের শক্তি। প্রাণের সেই আলোকে বিভূষিত হয়ে, জীবনের সেই বিভূতিতে মহীয়ান হয়ে, দ্বন্দ্ব-বিরোধে জয়ী হয়ে, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে যুগে যুগে মানুষের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা। কারণ যাদুবিদ্যার যুগে এই দেবতাই ছিল মানুষের কাছে জীবনের প্রতীক, মৃত্যুর প্রবল শত্রু,

("...they thought that by performing certain magical rites they could aid the god, who was the principle of life, in his struggle with the opposing principle of death."—James Frazer) ।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সুর হোচ্ছে প্রাণদ, প্রাণঘাতী নয়। লেনিন বলেছেন : "Life will assert itself"—জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। একথা প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পও বলে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাণীও জীবনের বাণী, সংগ্রাম-মুখরিত মানবেতিহাসের অক্ষরে অক্ষরে তার বোধন-রাগিণী ছন্দিত হয়, মহত্তর জীবনের আগমনী-নৃত্যের নুপুরশিঞ্জন তার অতিক্রান্ত পথে পথে আজও শোনা যায়। সংস্কৃতি তাই মানুষের কোনো বিশিষ্ট শ্রেণীর নয়। মানুষের জীবনই তার বেদী। যুগে যুগে ইতিহাসের অপরিহার্য্য দ্বন্দ্ব-গতির আবর্ত্তে এক এক শ্রেণী সেই বেদীর উপর অর্ঘ্য সঞ্চয় করে, যুগান্তরী মানুষ গতিবন্যায় তার শৈবালদাম ও আবর্জ্জনার অংশ ধৌত কোরে এগিয়ে যায়। বোধ করি, ম্যাক্সিম্ গোর্কির নিম্নোদ্ধৃত উক্তির মধ্যে সংস্কৃতির এই তাৎপর্য্যেরই ইঙ্গিত আছে :—

> It is stupid to say that culture is a bourgeois invention and therefore bad for us. Culture belongs to us ; it is our lawful property, our inheritance. We'll find out for ourselves what is superfluous in it and cast aside whatever is not wanted.
>
> (*Fragments from my Diary* : Maxim Gorki)

এই জীবনমন্ত্রের নামই মানবতা (Humanism)—সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বনেদী বনিয়াদ, চিরশ্যামল ভিত্তিভূমি। এ-যুগের সাহিত্য বা নূতন সাহিত্যেরও বনিয়াদ হবে এই জীবনমন্ত্র. তারও অন্তরে অনুরণিত হবে এই প্রাণের সুর।

এখন দেখব, এ-যুগের সুর কি ? এ-যুগের বনিয়াদও মানুষের সংগ্রাম, জীবনের কল্লোল , কিন্তু গদিয়ান হয়ে বসেছে ধনিক-সভ্যতা। তারই শাখা প্রশাখা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিজ্‌ম। তাই মানুষের সংগ্রাম এই শ্রেণী-সভ্যতার বিরুদ্ধে, মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে নয়। মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাশিস্টদের অর্থলালসা, রক্তপিপাসা ও নৃশংসতার ফলে

মহাযুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ হোচ্ছে বোলে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে পরাজয়ের গ্লানি আচ্ছন্ন করবে কেন? মৃত্যুর বিজয়-নিশান সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর কেন উড়বে? "ওয়েস্টল্যাণ্ড"-এর এলিয়ট, লরেন্স, হাক্সলী, এবং সেই বিষ-জর্জ্জরিত, সেই বীজাণু-সংক্রামিত আমাদের এই বাংলাদেশের কোনো এক সম্প্রদায়ের* সাহিত্যিকদের বিকৃত ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা, দুর্ব্বলতা-জনিত নৈরাশ্যবাদ, নিউরসিস-জনিত পাগলামি, স্ব-শ্রেণীজাত ভণ্ডামি, কেতাব-প্রসূত ন্যাকামি, বিলাস-ক্লান্ত-স্নায়ুজাত অসূয়া, নিষ্ক্রিয়তাজাত অবসাদ,—এই কি সত্য (Truth) ও বাস্তব (Reality)? জীবনের সমগ্রতার পরিচয় যার মধ্যে নেই, তা সত্যও নয়, বাস্তবও নয়। এই সব সাহিত্যিক, তাঁদের অস্বভাবী মনে আবেদন করে, এরকম কোনো ঘটনাকে গ্রহণ কোরে তারই ক্লোজ্ অপ্, মিড্ শট্ দেখান, পরিপূর্ণ জীবন দেখাবার মতো দৃষ্টির গভীরতা তাঁদের নেই। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, বিলাসী মন, আর অনুদার অন্তর নিয়ে মহৎ শিল্পী হওয়া যায় না। বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর সভ্যতার অপজাত অংশকে নস্যাৎ করতে গিয়ে তাই তাঁরা 'মানব-সভ্যতা' ও 'মানব-সংস্কৃতি'কে 'জাহান্নমে যাক' বোলে অভিশাপ দেন। সভ্যতার যে-অপজাত অংশ আজ ধ্বংসে পড়ছে, তারই পাশে মাটির জীবন্ত রসে পুষ্ট হয়ে যে-নূতন শ্রেণীহীন বিশাল মানব-সভ্যতা অঙ্কুরিত হোচ্ছে তা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় না। খণ্ড রূপ, বিকৃত প্রতিরূপের ব্যাভিচারেই তাঁদের আনন্দ, আমরা তাঁদের করুণা করি। (এখানে প্রসঙ্গত ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের কাছে লিখিত জে. এ. স্পেণ্ডারের 'আধুনিক কাব্য' সম্বন্ধে একখানি চিঠির কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ছে। জে. এ. স্পেণ্ডার লিখেছেন: Be pessimistic, if you must, but don't be misanthropic. Man, after all, is the king of beasts, and if you wish to influence him, you must treat him with respect. He "lives by admiration, hope and love"; you must give him something to admire, something to hope for, something to love. এই কথা বোলে জে. এ. স্পেণ্ডার বলেছেন,

* এখানে বাঙলাদেশের যে-সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করা হোলো এই বইয়ের "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা" নামক অধ্যায়ে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যাবে।

I speak as an impenitent traditionalist. অনেক সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট হয়তো আঁতকে উঠবেন, কিন্তু কম্যুনিজ্‌মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেও আমি বলতে পারি যে, আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই ট্র্যাডিশানালিস্ট স্পেণ্ডারের এই উপদেশ পালনে উপকৃত হবেন, আমরাও হব।) আমরা বলি, যতো খুশি ঘৃণা করো ধনিকশ্রেণী-সভ্যতার আপজাত্যকে, যে-সভ্যতা মানবতাকে অশ্রদ্ধা করে, ধর্ম্মের মুখোশ প'রে অধর্ম্মের উপাসনা করে, ভদ্রতার ছদ্মবেশে বর্ব্বরতার জয়গান গায়; নারী যার কাছে নিলামের পণ্যের মতো, শিশু যার কাছে বলিদানের বস্তু—সে-সভ্যতাকে প্রাণভরে অভিশাপ দাও, সেই খুনে বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে অন্তরভরে ঘৃণা করো; কিন্তু তাই বোলে মানুষের সভ্যতাকে, সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে ঘৃণা কোরো না, দিকভ্রান্ত হয়ো না। পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী, জনগণ, সংস্কৃতির স্রষ্টা ও পূজারী যারা, আজ তারা যে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব-সভ্যতাকে উন্নততর পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের আদর্শ নিয়ে বিশ্বাস ফিরিয়ে আন, আশা আন, জয় হবেই। কারণ এই তো জীবন, জীবনের পরাজয় নেই।

কিন্তু মানবতা বা মনুষ্য-প্রীতি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতো আমরা বলতে পারি না যে, "মহান্ পুরুষে"র প্রতি যে-প্রেম এবং তাঁর সম্বন্ধে যে-জ্ঞান, আমাদের সকলের মধ্যে—অর্থাৎ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে—সেই প্রেম ও জ্ঞান বিদ্যমান; সে-প্রেম সকল প্রেমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এবং সেই প্রেমের পূর্ণতার জন্যে কোনো ক্লেশই, এমনকি মৃত্যুও, দুঃখদায়ক নয়। উপনিষদের সেই "ঈশকে" (ঈশ্বর) উপলব্ধি করা, এবং তাঁর প্রেম ও সেবার জন্যে আত্মোৎসর্গ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

> We must realise...the love and wisdom that belong to the Supreme Person, whose Spirit is over us all, love for whom comprehends love for all creatures and exceeds in depth and strength all other loves, leading to difficult endeavours and martyrdoms that have no other gain than the fulfilment of this love itself.
>
> (Rabindranath Tagore: *The Religion of Man.*)

রবীন্দ্রনাথের এই বিমূর্ত্ত বিশ্বমানবিকতার সরল অর্থ হোচ্ছে—ঈশ্বর-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের একাত্মীকরণ। এই মানুষ অনৈতিহাসিক, শ্রেণী-উত্তর ও বায়বীয় গুণসমষ্টি-বলে অতি-মানুষ (Super-man) ও বিরাটাত্মা (Super-soul) হয়। কিন্তু আমরা বলি যে, এ শুধু জাগরস্বপ্ন, বাস্তব থেকে বিষঙ্গের ফলে অধ্যাত্মিক দর্শন এর আশ্রয়স্থল হয়। এ অসম্ভব, আজগবি, মানুষের ইতিহাস-বিরোধী। এমন কি এই অধ্যাত্মবাদ আজ ধনিকবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদের সর্ব্বপ্রধান সহায় হয়েছে। এ আমাদের গবেষণা নয়, (শ্রদ্ধেয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশও নয়) ইতিহাসের রায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্য্যন্ত চার্চগুলি তাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্যে প্রধানত সংস্কারের উপর নির্ভর করেছে, এবং স্বর্গের সুখ ও নরকের বিভীষিকা সম্বন্ধে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে তারা সফলও হয়েছে। ১৮৩৯ সালে চার্টিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রেভারেণ্ড জে. ফ্রান্সিস বলেছিলেন, “রাজনৈতিক আন্দোলন ও গোলযোগ দমন করবার একমাত্র উপায় হোচ্ছে, সকলকে নরকের বিভীষিকাময় অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো, এবং দুষ্টেরা যে চিরদিন সেখানে নিদারুণ যন্ত্রণা ও কঠোর শাস্তি ভোগ করে—এই ধারণার সৃষ্টি করা।” এমন কি নরকাগ্নির এই নীতিতে মানুষের বিশ্বাস দিন দিন ক'মে যাচ্ছে দেখে গ্ল্যাডস্টোন্ পর্য্যন্ত বলেছিলেন যে, সেণ্ট্ পলের এই বশীকরণ-অস্ত্র ব্যবহার না করলে রাজনৈতিক অশান্তির সম্ভাবনা আছে। খৃষ্টধর্ম্মের আধুনিক অস্ত্র (শাণিত) “প্রেম” ও “ভ্রাতৃভাব”; কারণ এই আফিম খাইয়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, বিরোধ থেকে তাদের বিপথে চালিত করবার এইটাই সুপ্রশস্ত পথ। চতুর্দ্দশ বেনেডিক্ট গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁর প্রচারপত্রে সেইজন্য লিখেছিলেন, “এই ভীষণ অশান্তির কারণ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি শাসিতদের উপযুক্ত শ্রদ্ধার অভাব। যেদিন থেকে ত্রিভুবনাধীশ্বর ভগবানকে অস্বীকার কোরে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি হয়েছে মানুষের শক্তির উৎস, সেদিন থেকে সাধারণ নিম্নস্তরের মানুষ তাদের শ্রদ্ধেয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। মানুষকে আমরা সাবধান কোরে দিচ্ছি, তারা যেন মনে রাখে যে,

ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই, এবং মানুষের উপর যে-শক্তিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, দেবতাই সেই শক্তির উৎস।" ফ্যাশিজ্‌ম-এর মধ্যেও এই "অতি-মানুষ," "দেবতা" ও "বিরাটাত্মার" জয়গান উচ্চতম গ্রামে ধ্বনিত হয়েছে! এক কথায় বলা চলে যে, "পরমেশ্বর" বা "অতি-মানুষই" ফ্যাশিজ্‌ম-এর শক্তির সর্ব্বপ্রধান উৎস। ইতালীয় ফ্যাশিজ্‌ম-এর সহকারী দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

> "Human being is naturally religious. To think means to contemplate God. The more one thinks, the more one feels oneself in the presence of God. As against man, God is everything, man is nothing."—Giovanni Gentile : *Fascism and Culture.*

এর পরেই সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন হিটলারের মধ্যে, মুসোলিনীর ও জাপানের সমরকর্ত্তাদের মধ্যে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলিদান দেওয়া হয়; কারণ এ তো হত্যা নয়, আত্মোৎসর্গ, দেবতার বেদীমূলে বিনা অভিযোগে আত্মদান। আমাদের এদেশেও এই দেবতা অনেক 'সৎসঙ্গে', অনেক 'বাবা'র আশ্রমে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, সময়মতো কোনো বীরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে কালবিলম্বও করবেন না। (এখানে অনেকে রুষ্ট হয়ে বলবেন যে, আমি পারতপক্ষে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথকে 'ফ্যাশিস্ট' বলেছি, আমার শালীনতা জ্ঞান নেই। আমার উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে', 'রাশিয়ার চিঠি,' 'কালান্তর' প্রভৃতি পড়েছি। অতএব শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু 'দার্শনিক' বা 'বিশ্বপ্রেমিক' রবীন্দ্রনাথকে জীবন্ত ইতিহাস যদি অস্বীকার করে তাহোলে আমি সহায়হীন।)

এর পর স্বাভাবিক প্রশ্ন হবে (যদিও প্রশ্ন অর্থহীন) যে, ধর্ম্ম যদি অধার্ম্মিকের কবলে প'ড়ে উন্মার্গ হয়, তার পুনরভিষেক কি সম্ভব নয়? সমবেত কণ্ঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উত্তর দেবেন, "সম্ভব নয়।" যুগে যুগে, হাজার বৎসর ধরে' এই ধর্ম্মের পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং সে-পরীক্ষার ব্যর্থতা রক্তাক্ষরে আজ মানুষের ললাটে লেখা রয়েছে। অতএব পরীক্ষা শেষ হোক, ভয়ানক 'ছিনিমিনি' খেলা শেষ হোক, 'ভেকেরা' বাঁচুক! ক্ষতি কি?

জগদ্বিখ্যাত নৃতাত্বিক ও সংস্কৃতি-সাধক ডাঃ ফ্রেজার মানব-ধর্ম্মের ও মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণা কোরে যে-কথা বলেছেন, তা আমাদের চিন্তার যোগ্য নয় কি ?

> To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of men in the past, and they will be the primary wants of men in the future... Other things may be added to enrich and beautify human life, but unless these wants are first satisfied, humanity itself must cease to exist.—*The Golden Bough.*

ফ্রেজার যা বলেছেন কার্ল মার্কস্‌ও শিল্প সম্বন্ধে ঠিক তাই বলতেন। পৃথকভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কোনো গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিতে মার্কস্ চেষ্টা করেননি, কারণ তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যতদিন অর্থনৈতিক বৈষম্য না দূর হোচ্ছে ততদিন শিল্প বা সাহিত্যের সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথ অবরুদ্ধ থাকবে। উদরে বুভুক্ষার আগুন নিয়ে নন্দনশাস্ত্রের নিয়ম অনুধাবন কোরে শিল্পের রস বা সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। লেনিনের লক্ষ্য যদিও একই ছিল তাহোলেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবার পূর্ব্বেও যে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যতদিন অন্নবাস সমস্যা মানুষকে পীড়া দেবে এবং তাদের জীবন স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, ততদিন শিল্প বা সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ ও উপলব্ধি সম্ভব হবে না। সাম্যবাদের উদ্দেশ্য হোচ্ছে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন একটি স্বচ্ছল স্তরে উন্নীত করা যেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় অন্তরায় দূর হয়ে যাবে। এই সব দৈনন্দিন জীবনের প্রাণঘাতী প্রতিবন্ধক অপসারিত হোলে মানুষ শিল্প-সৃষ্টির ও তার রসোপলব্ধির জন্যে অফুরন্ত অবসর পাবে। লেনিন সেইজন্যই বলতেন ঃ

> Art belongs to the people. It ought to extend with deep roots into the very thick of the broad toiling masses. It ought to be intelligible to these masses and loved by them. And it ought to 'unify the feelings, thought and will of these masses, elevate them. It ought to arouse and develop artists among them.

শিল্প মানুষের। শিল্পের শিকড় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত হয়ে সেখান থেকে রস গ্রহণ কোরে পুষ্ট হবে। সাধারণের কাছে শিল্প সুবোধ্য ও প্রিয় হবে। তাদেরই চিন্তা ও অনুভূতিকে শিল্প রূপায়িত করবে। কিন্তু এ-যুগে শিল্প তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। এ-যুগে নয় শুধু, মানুষের ইতিহাসে যেদিন থেকে শ্রেণী-অভিভাবকত্ব সুরু হয়েছে সেই প্রভুর যুগ থেকে এই ধনতান্ত্রিক যুগ পর্য্যন্ত শিল্প হয়েছে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, বাণিজ্যের মতো সেখানেও তাদের একচেটিয়া অধিকার। তাই শ্রেণীসমাজে শিল্পের মহিমামণ্ডিত পরিপূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব নয়। যে-শ্রেণী আজ সর্ব্বসাধারণের সুমুখে পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধক স্বরূপ তাকে ধ্বংস করা সাম্যবাদীর কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য। ধনতন্ত্র আজ আর ফলপ্রসূ নয়, ঐতিহাসিক ভূমিকা তার শেষ হয়েছে, আজ সে অনুর্ব্বর, শক্তিহীন, জ্বরগ্রস্ত। জ্বরা ও মৃত্যুর বীজাণু মানুষ ও সমাজের মধ্যে সংক্রামিত করা ভিন্ন তার আর অন্য কিছু করণীয় নেই। ম্যাক্সিম্ গোর্কির কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য, "Capitalism violates the world as a senile old man violates a young, healthy woman whom he is impotent to impregnate with anything besides the diseases of senility."

সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ও শিল্পের মতো নূতন সাহিত্যেরও ভিত্তি হবে মানবতা, কিন্তু সে-মানবতা ঈশ্বর-ধর্ম্মের ঊর্দ্ধটানে নভোচারী মানবতা হবে না। এই নভোচারী মানবতাকে ম্যাক্সিম্ গোর্কি বলেছেন "পাশবিকতা"। এ-যুগের মানবতা বা "Proletarian Humanism" বৈষ্ণবী প্রেমের মহিমা-কীর্ত্তন করবে না, অস্পষ্ট ছায়ালোকে মূর্ত্তিহীন, জীবনেতিহাসহীন মানুষের আরাধনা করবে না। যে-শ্রেণীর সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-ক্রীতদাসত্ব ও জিঘাংসা মানবতা-বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে, তাকে ঘৃণা করবে, অশ্রদ্ধা করবে, কটূক্তি করবে; সঙ্গে সঙ্গে সুগম করবে শ্রেণীহীন মানব-সমাজে বিশাল মানবতার বিকাশের পথ। 'নূতন সাহিত্যে'র এই হোচ্ছে ভূমিকা, এবং এই 'মানবতা' নূতন সাহিত্যের ভিত্তি। এর পরিণতি বিশ্বমানবতায়, কারণ তখন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না, শ্রেণী-প্রভুত্ব থাকবে না; সাম্য, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্য হবে শিব ও সুন্দর দুইই।

সে-মানবতা নভোচর না হয়ে হবে স্থলচর এবং মহাশূন্যযাত্রী শিল্পীর স্বপ্নচারিতাও দূর হবে।

বাংলাদেশেও এই একই মানবতার ভিত্তির উপর আমাদের নূতন সাহিত্য গড়ে' উঠবে। এদেশের বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক বিকাশ না হোলেও, এবং এখনো আমাদের মাটিতে সামন্ততন্ত্রের সোঁদা গন্ধ জড়িয়ে থাকলেও, দুরন্ত ঘটনার ও পরিবর্ত্তনের স্রোতে, আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক আবর্ত্তের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অকালপক্ক হয়ে গিয়েছে এবং সামন্ততন্ত্রও তীরবেগে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু কামনা কোরে আমরা ধনিকগোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করব না। সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র-বিরোধী, কিন্তু ধনোৎপাদন-বিরোধী নয়। যে-শিশু সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত এবং চিকিৎসার অতীত, তার মৃত্যুই শ্রেয়।

বাংলাদেশের সাহিত্যে যে-নূতন সমাজতান্ত্রিক সুর ঝঙ্কৃত হবে সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পৌরুষহীন ভাবালুতার আবিলস্পর্শ থাকবে না, পারমার্থিক প্রেমতন্ময়তা থাকবে না। সে-রসে, সে-প্রেমে ও সে-ভাবে মশগুল্ যাঁরা তাঁদের কানে হয়তো সে-সুর কর্কশই শোনাবে, তবু নূতন সাহিত্যিকেরা গাইবেন না—

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলায় তারে॥

কোনো বৈষ্ণব সমালোচক বলবেন, এই প্রেম "বেদবিধির অগোচর, যে রসে গর গর, যাহার রসের অন্তর, সেই সে মরম জানে", অন্য কেউ জানে না। আমরা বলি যে জেনে প্রয়োজন নেই। বেদবিধির অগোচর যা তা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য করবারও সাধ্য নেই, আমরা রসে গর গরও নই, রসের অন্তরও

নেই আমাদের, অতএব ওর মর্ম্মও আমাদের কাছে অর্থহীন। অবশ্য এই শ্রেণীর রসিক দু'একজন আমাদের দেশে এখনো আছেন, যেমন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার একজন। মোহিতবাবু বলেন, "যদি সাহিত্যের পক্ষ হইতে বলা যায় এটা ভিড় করিবার স্থান নয়, রস উপভোগ করিবার শক্তি সকলের নাই, তাহা হইলে সংসার ও সমাজের তাহাতে রুষ্ট হইবার কারণ নাই, পাগলের দলে ভিড়িবার সখ না হওয়াই শ্রেয়।" মোহিত বাবুর স্বীকারোক্তির জন্যে (অজ্ঞানেই হোক্ বা সজ্ঞানেই হোক্) আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, সত্যই আমরাও মনে করি যে "পাগলের দলে ভিড়িবার সখ না হওয়াই শ্রেয়।" মোহিতবাবু বলেন, "যাঁহারা সেই রসিক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় না, কোন জিজ্ঞাসা আর তাঁহাদের নাই, তাঁহারা কেবল চক্রে বসিয়া একত্রে ঢালেন ও পান করেন—একেবারে বুঁদ হইয়া থাকেন, কথা কহিয়া নেশাটিকে তরল করিতে চান না।" এই গুহ্যসাধনার ভৈরবীচক্র মোহিতবাবু ও তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রাণভরে গড়ুন, যেকোনো "নেশার আড্ডায়" (সাহিত্যেরই হোক্ বা ধর্ম্মেরই হোক্) যোগ দিয়ে "বুঁদ" হয়ে থাকতে আমরা নারাজ, কারণ সাহিত্যকে আমরা আমাদের বোলে দাবী করি এবং সাহিত্যের রসোপলব্ধি যে মানুষের বোধেন্দ্রিয়গোচর হবে তাও বিশ্বাস করি। যে-সাহিত্য তা নয়, তা মহৎ সাহিত্য নয়। এযুগের যে নূতন সাহিত্যের আমরা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করব তা অতীন্দ্রিয়, অতি-মানবিক বা আধিদৈবিক হবে না, তা হবে ইন্দ্রিয়গোচর, মানবিক ও পার্থিব। সুতরাং সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো এই নূতন সাহিত্যেরও যে-মানবতা ভিত্তি হবে, তা দেহাতীত মানবতা হবে না। মানবতার মূল্য সে বাস্তবের কষ্টিপাথরে কষে' নেবে, সেখানে কোনো মনুষ্যরূপী 'পশুশ্রেণী' যদি 'ধিক্কার' ও 'কটূক্তি' উপহার পায় তাহোলে তাও বরণীয় ও আদরণীয় হবে নূতন সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের কাছে। এই নূতন সাহিত্যিকেরা সাম্যবাদী, কারণ এই অধর্ম্ম, পাশবিকতা ও বর্ব্বরতার যুগে একমাত্র সাম্যবাদীরাই সত্যকার মানবতার অর্চ্চনা করেন, অপরিসীম সহিষ্ণুতার সহিত শ্রদ্ধাভারানত অন্তরে।

চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক

কনফুসিয়াস্ একদিন "তাই" পর্ব্বতের পাদদেশে নির্জ্জনে বসেছিলেন, এমন সময় দূর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কাতর বিলাপ তাঁর কানে ভেসে আসে। স্ত্রীলোকটি কেন অমনভাবে একা বসে' বিলাপ করছে, সন্ধান করতে তিনি জুলুকে পাঠালেন। প্রশ্ন করতে স্ত্রীলোকটি বললে: "আমার শ্বশুরকে এখানে বাঘে হত্যা করেছিল, আমার স্বামীকেও করেছে এবং শেষে আমার ছেলেটির অদৃষ্টেও তাই ঘটল।"

কনফুসিয়াস্ বললেন: "এমন ভীষণ জায়গায় তাহোলে তুমি একা রয়েছ কেন?"

স্ত্রীলোকটি বললে: "কারণ এখানে কোনো অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা নেই।"

কনফুসিয়াস্ তাঁর শিষ্যবর্গকে আহ্বান কোরে বললেন: "সুধিজন, স্মরণ রেখো, বাঘের চাইতেও অত্যাচারী শাসক বেশী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ।"

চীনের আজকে এই নির্জ্জন "তাই"-পর্ব্বতবাসিনী স্ত্রীলোকটির মতো দুরবস্থা। বাঘ আর অত্যাচারী শাসকের মধ্যে তার জীবন, একদিকে নিপ্পনের বর্ব্বরতাবিলাস আর একদিকে জাতীয় শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীবৈরিতা। চীনের স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তাকে সাম্রাজ্যবাদীরা তার চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বোলে উপহাস করেছে এবং তার তুলনায় নিজেদের শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে চীনের জাতীয়তাকে সদম্ভে পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি যে শুধু চীনের শ্রেণী-স্বার্থভীরু শাসকগোষ্ঠী নয়, চীনের মুক্তিকামী জনগণ আভ্যন্তরীণ বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পারিক বৈষম্য প্রভৃতি সাময়িক বিস্মৃত হয়ে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে, নদীর ধারে, সমবেত শক্তি ও দৃঢ়তার সাহায্যে সাম্রাজ্য-বুভুক্ষু জাপানের মধ্যযুগীয় পাশবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অগণিত দুঃখকষ্ট

ও অসুবিধার মধ্যেও সে-সংগ্রাম জয়বিশ্বাসে জীবন্ত ও নির্ভীক। গত ৭ই জুলাই তারিখে চীনের যুদ্ধ তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শত্রুকে প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণ করবার সঙ্কল্প চীনের এতটুকুও কমেনি। মার্শাল পেতঁ্যা, জেনারেল ওয়েগাঁ প্রমুখ ফ্রান্সের শাসকবর্গের ফ্যাশিজম্-প্রীতি যেমন তাঁদের প্রলুব্ধ করেছে শত্রু নাৎসীদের লজ্জাকর সর্ত্ত মাথা হেঁট কোরে স্বীকার কোরে নিতে, তেমনি যে চীনের কেউ কেউ স্বীকার করেননি তা নয়। ওয়াং চিং-ওয়াই প্রমুখ ফ্যাশিজম্-মুগ্ধ কাপুরুষ দেশনেতারা শত্রুর কাছে দাসত্বের দাসখৎ লেখাবার জন্যে দেশবাসীদের অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু "অহিফেনপ্রিয়", "স্বাভাবিক দুর্ব্বল", "শান্তিপ্রিয়" চীনের জনসাধারণ এবং যুদ্ধরত চীনের নায়ক মার্শাল চিয়াং কাইসেক বা মাও সে-তুং কেউই সে-সর্ত্ত মেনে নিতে স্বীকার করেননি। চীনের জনগণের অনির্ব্বাণ সহিষ্ণুতা ও সঙ্কল্পের শিখায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত চীন অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের পণ করেছে।

এই যে সংগ্রাম এবং এর পিছনে এই যে পর্ব্বতপ্রমাণ বিশ্বাস ও আশা, এর উৎস শুধু দেশনায়ক মার্শাল চিয়াং বা গণনায়ক মাও সে-তুং নয়, চীনের গরিলাবাহিনীও নয়, চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীরাও আছেন। গরিলা-বাহিনীর মতো তাঁদেরও বিরাম নেই, স্বস্তি নেই, দেশনায়কদের মতো তাঁদেরও শান্তি নেই। সংগ্রামশ্রান্ত চীনবাসীদের ক্লান্তি, ভীতি ও নৈরাশ্যকে দূর কোরে, তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথ বার বার আলোকিত কোরে, আসন্ন নূতন প্রভাতের বারতা জানিয়ে উৎসাহিত করাকে এই সব সাহিত্যিকেরা এঁদের কর্ত্তব্য বোলে মনে করেন। নান্‌কিং, হাঙ্কাও বা চুংকিং-এর ইমারৎ-কক্ষে ব'সে সংবাদপত্রের মর্ম্মান্তিক বিবরণ পাঠ কোরে এই কর্ত্তব্যের বা দায়িত্বের উপলব্ধি যান্ত্রিক প্রয়াসসাপেক্ষ নয়। সমরক্ষেত্রে সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়ে, নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার মুখোমুখী হয়ে, সংগ্রামরত সামরিকের আশা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে, বিচিত্র রামধনু রঙে রঞ্জিত হয়ে, মুক্ত মানুষের, স্বাধীন মানুষের, বিজয়ী মানুষের যে-রূপানুভূতি তাঁদের অন্তরে জাগে, তাঁদের সাহিত্য হোচ্ছে তারই সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রচারের দামামা-বাদ্য যদি তার মধ্যে কখনো স্পন্দিত হয়, তাহোলে তা রণাঙ্গনের পৈশাচিক

বিস্ফোরণকে নিস্তব্ধ করবার জন্যে, প্রচারকের ক্ষণিকের উন্মত্ততা পরিতৃপ্তির জন্যে নয়।

এই পটভূমিকায়, চীনের এই ঐতিহাসিক ভাগ্যবিবর্ত্তনের ছন্দের তালে চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল্য যাচাই করতে হবে।

চৈনিক সাহিত্যের ইতিহাস আজকের ইতিহাস নয়, গত তিন হাজার বছরের ইতিহাস। খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ শতাব্দীতে কনফুসিয়াস্-এর রচিত চীনের গ্রাম্যগীতি প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত চীনের সাহিত্যে সামান্য পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু গত তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে গত দুই দশকের চৈনিক সাহিত্যের জীবনই সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। হান্ বংশের রাজত্বকালে প্রথমদিকে (খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০—খৃষ্টাব্দ ২২০) চীনের যে ক্ল্যাসিকাল যুগ এসেছিল, অল্প সময়ের জন্যে তার পুনরাবির্ভাব হয় সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে (৯৬০—১২৬০ খৃষ্টাব্দ) কনফুসীয় পণ্ডিতদের দ্বারা। টাঙ্ ও সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে (৬৮৯—৭৪০) কাব্যে রোমাণ্টিক আন্দোলনও দেখা দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সাহিত্যের আবয়বিক ও ভাষাগত পরিবর্ত্তন ছাড়া, ভাবগত কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়নি। চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজই ছিল সে-সাহিত্যের উপাদান। চীনে কোনো বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বাইরের সমাজে বা ভিতরের মানুষের মনে কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেনি, প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি অটুটই ছিল এবং সাহিত্যও তাই সামন্ততন্ত্রের বুক থেকে রস নিঙড়ে জীবনধারণ করেছে।

কিন্তু কোনো যুগই অবিনশ্বরতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসে না। কোনো কোনো যুগ বিশেষ প্রতিবেশের অনুকূলতায় দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে, কিন্তু চিরঞ্জীব কেউ নয়। প্রতীচ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র যখন শক্তিশালী হোতে লাগল, তখন চীনের অফুরন্ত অব্যবহৃত ঐশ্বর্য্য সেই বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্রকে সম্প্রসারণের অভিনন্দন জানাল। স্ফীতকলেবর ধনতন্ত্র স্বদেশে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ভোগ কোরে বাইরের মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে আয়ু অন্বেষণে অভিযান সুরু করল। অর্থাৎ ধনিকবাদ ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদে রূপ

পরিগ্রহ করল। প্রসারমুখী ধনতন্ত্র চীনের স্বাবলম্বী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস কোরে, তাকে স্বাধিকারভোগের স্বাধীনতার সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনল অর্দ্ধ-উপনিবেশের আসনে। সে-কাহিনী এক সুদীর্ঘ করুণ কাহিনী, যৌবনমদমত্ত ধনতন্ত্রের আবশ্যকীয় বিলাসের ইতিহাস। ব্রিটেনের সঙ্গে অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০—১৮৪২), ফ্রান্স (১৮৫৬—১৮৫৮) ও জাপানের (১৮৯৪—১৮৯৫) সঙ্গে সংঘর্ষ, এই সব হোচ্ছে তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এতদিন পরে চীনের সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-জীবনের শান্তিপ্রিয়তা, জড়তা ও সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণবিচূর্ণ কোরে বিদেশী মূলধনের প্রবল প্রবাহ চীনে নূতন সমাজের বীজ বপন করল। বিদেশী মূলধনের তরঙ্গাঘাতে নূতন সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত পেয়ে জাতীয় ধনতন্ত্রও সমাজতন্ত্রের বিলাসক্রোড় ছেড়ে মাথা উঁচু করল, কিন্তু বিদেশীর উদ্যম ও তারুণ্যের কাছে চীনের শিশু, দুর্ব্বল ধনতন্ত্র শক্তি-প্রতিযোগিতায় হার মানল। তখন আর তাই পূর্ব্বের মতো সামন্ততন্ত্র বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভারবাহী স্তম্ভ রইল না, বরং সময়ের তাগিদে প্রয়োজন হোলো তার বিলুপ্তির, জাতীয় ধনতন্ত্রের নবজীবনের স্ফূর্ত্তির জন্যে। সামন্ততন্ত্রের জঘন্যতম প্রতীক মাঞ্চু বংশের ধ্বংস তাই অনিবার্য্য হয়ে এল। ফলে হোলো ১৯১১ সালের যুগান্তকারী জাতীয় বিপ্লব, যখন চীনের তিন হাজার বছরের প্রাচীন, জ্বরগ্রস্ত একরাজকত্ব ধূলিসাৎ কোরে প্রতীচ্যের অনুকরণে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হোলো। ঐতিহাসিক নিয়মানুবর্ত্তনে এক যুগের অবসান হয়ে হোলো আর এক যুগের উদয়।

যুগে যুগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের আবর্ত্তে ঘটে রাজনৈতিক রূপান্তর এবং এই ওলটপালটের মধ্যে মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকগুলির, যেমন শিল্প, সাহিত্য, আইন প্রভৃতির ক্রমিক পরিবর্ত্তন হোতে থাকে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন যেমন বৈজ্ঞানিক বিচারাধীন, এগুলির পরিবর্ত্তন ঠিক তেমনভাবে বিচার করা যায় না। নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চেতনা ক্রমে ক্রমে জীবনের এই দিকগুলির উপর আলোক বিকিরণ করে, যেমন রাত্রিশেষে পূর্ব্বাচলে উদীয়মান সূর্য্য নূতন প্রভাতকে ধীরে ধীরে অভিনন্দন জানায়। পরিবর্ত্তনের চেতনার যে ক্রমজাগরণ হয়, বিপ্লবকালীন প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম কোরে সেই চেতনা

ক্রমে পারিপার্শ্বিক কুয়াশা ও অন্ধকারকে অপসারণ কোরে নূতন জীবনকে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত করে। কার্ল মার্কস্ এই কথাই বলেছেন ঃ

> In considering...revolutions the distinction should always be between the material revolution in the economic conditions of production which can be determined with the precision of natural science, and the juridical, religious, aesthetic or philosophic,—in short, ideological forms—in which, men become conscious of this conflict and fight it out. (Karl Marx-এর 'Critique of Political Economy'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

চীনের জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সাহিত্যেও বিপ্লবের স্পন্দন অনুভূত হোলো। ভাব বা অনুভূতির পরিবর্ত্তনের প্রথম প্রকাশ হয় ভাষায়, কারণ ভাবের বাহন ভাষা। প্রাচীন ভাষাকে ভেঙেচুরে তাকে নূতন ভিত্তির উপর গড়বার জন্যে প্রয়াস পেলেন ডাঃ হু শীহ। চীনের নূতন ধনিকগোষ্ঠী যেমন সামন্ততন্ত্রকে নিজেদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় বোলে মনে করল, তেমনি চীনের নূতন সাহিত্যকেও বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রাক্তন "ওয়েন্ ইয়ান্" (Wen Yan) ভাষা (মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের ভাষা, যাকে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন্ ভাষার সঙ্গে তুলনা করা চলে) নূতন ভাব বিকাশের পথে বাধা বোলে মনে হোলো। নূতন শিল্পীরা বলেন যে, ভাষা হবে স্বতোৎসারিত, তাতে অন্তরের আবেগস্পর্শ থাকবে, পুরাতন পণ্ডিতের অস্বাভাবিক প্রজ্ঞাকুশলতা থাকবে না। নূতন সাহিত্যিকেরা সেইজন্য সাধারণ ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন এবং ভাষা-সংস্কারের এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা হোলেন ডাঃ হু শীহ।

ভাষায় এই আন্দোলন ক্রমে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হোলো। সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ সমাজব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন চীনের নূতন সাহিত্যিকেরা। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এবং ১৯১৫ সালে পিকিঙ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানের "একুশটি সর্ত্ত" অস্বীকৃত হওয়ার পর, আন্তর্জ্জাতিক দরবারে চীনের সম্মান গেল বেড়ে। পাশ্চাত্য জাতিগুলি য়ুরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপৃত রইল এবং চীন রইল জাপানের ঔদ্ধত্যকে প্রতিরোধ করবার জন্যে। চীনের জাতীয়

শিল্পব্যবসা উন্নতির অবকাশ পেল। বিপ্লব শুধু সংস্কৃতি বা অর্থনীতির মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, সমগ্র জাতির পুনর্জীবনের জন্যে নিয়োজিত হোলো। ১৯১৯ সালে ভের্সাই-এ বৃহৎ শক্তিগুলি যখন পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত, তখন চীন মিত্র হিসাবে আশা করেছিল যে, জার্ম্মান অধিকৃত তার হৃত অঞ্চলগুলি বোধ হয় সে আবেদন করলেই ফিরে পাবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উদ্ধত জাপান বৈঠকে অসহযোগিতা করবার হুমকী দিয়ে জার্ম্মানির পূর্ব্বেকার সুযোগসুবিধার নিজে অধিকারী হোলো। পিকিঙ-এ যখন এই সংবাদ এসে পৌঁছল তখন ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বেরুল ৪ঠা মে তারিখে, এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং এই আন্দোলন ক্রমে শান্টুঙ, শান্সী, হোনান্, কিয়াঙস্থ, হুপে ও অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল। সাংহাই ও তিয়েনৎসিনের মতো সহরে সকলশ্রেণীর লোকে মিলিত হয়ে ধর্ম্মঘট কোরে পিকিঙ গবর্ণমেন্টকে এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের আন্তরিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল। প্রেসের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, গোপন ষড়যন্ত্রকারীর শাস্তি, দেশের স্বাধীনতা-বিক্রেতাদের ধ্বংস, চীনের জনগণ দাবী করল। দলে দলে যেসব যুবকেরা এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল, তারা সব চীনের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বংশধর। সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাই এই ৪ঠা মে'র আন্দোলন চীনের নবযুগ বোলেই গণ্য হবে। চীনের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাগরণের যুগের এই হোলো সূচনা। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই হোচ্ছে চীনের জাতীয় ধনিকগোষ্ঠী, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের বরপুত্র এরা।

এই নবযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সামন্ততন্ত্রের টলটলায়মান প্রাসাদ ধসে' পড়ল। পুরাতন নীতি, পুরাতন ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনকে সাহিত্যে প্রকাশ করবার তাগিদ এল। এই সাধারণ মানুষ আর কেউ নয়, নবযুগের নগরবাসী মধ্যবিত্তশ্রেণী। নূতন গবর্ণমেন্ট ও নূতন সামাজিক ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সকলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপযোগী নূতন সাধারণতন্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হোলো। বিজ্ঞান,

দর্শন প্রভৃতির রীতিমত বিতর্ক স্থরু হোলো। বিবাহ, প্রেম, প্রভৃতি নানারকম সামাজিক সমস্থার প্রকাশ্যে যুক্তি দিয়ে আলোচনা হোতে লাগল। এই সময় "New Youth" নামে মিঃ চেন্ তু-হৃশিউ-এর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় এই সব নূতন বিষয় আলোচিত হোতো। লু-হস্থন-এর সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিখ্যাত "Look Here" নামক ছোট বই এই সময় প্রকাশিত হয়। এই সময় প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণীই হোলো চীনের নূতন সাহিত্যের অনুপ্রেরণার উৎস।

কিন্তু এই চৈনিক রেনাসাঁস আন্দোলন য়ুরোপীয় রেনাসাঁস-এর পথ অনুসরণ কোরে অগ্রসর হোতে পারল না। চীনের নবযুগের আন্দোলনের শিশু-হত্যা হোলো, কারণ য়ুরোপীয় মহাসমর শেষ হওয়ার পর বৃহৎ ধনতান্ত্রিক জাতিগুলি পশ্চাৎগামী জাতিগুলির উপর প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সাম্রাজ্য-বুভুক্ষা ও পুঁজিলালসা মহাযুদ্ধের ফলে আরো তীব্রতর হোলো। চীনের বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্রকে হত্যা কোরে, সাম্রাজ্যবাদীরা সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশিষ্ট সমরপ্রভুদের উপর প্রভাব বিস্তার কোরে, নিজেদের পুঁজির বাজার ঠিক করতে ব্যস্ত হোলেন। ফলে চীনে দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিপ্লব আরম্ভ হোলো, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেখা দিল দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা। এইভাবে চীনের নবযুগ অসময়ে অস্ত গেল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত চীনের প্রতিবেশের প্রতিকূলতা সকলের মনে অবনমিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। চীনের সাহিত্য এর থেকে নিষ্কৃতি পেল না। সাহিত্য হোলো প্রাণহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, নিস্তেজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুষ রিয়ালিষ্ট্ ডস্ট্ওয়েভ্স্কি, ফরাসী ন্যাচারালিষ্ট্ ফ্লোবের, মোপাশাঁ, সুইডিশ লেখক ষ্ট্রিণ্ড্বুর্গ, নরওয়েজীয়ান্ লেখক হামজুন্, এঁরা হোলেন চীনের সাহিত্যিক-দের আদর্শ। এই সময় চীনের সাহিত্যিকেরা য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হন, দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯২২ সালে "Chuang Tsao" (Creation বা সৃষ্টি) নামে একটি সাহিত্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকজন "বিশুদ্ধ শিল্পবাদীদের" নিয়ে। "শিল্পের খাতিরে শিল্প" (Art for Art's sake) এই সঙ্ঘ প্রচার করে এবং এই সময় উ তা-ফুর "Fallen" নামক 'decadent' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আর

একদল শিল্পী ছিলেন যাঁরা কাল্পনিক ভবিষ্যৎ রূপায়িত করতেন তাঁদের শিল্পে এবং এঁদের মধ্যে কো মো-জো-এর নামই উল্লেখযোগ্য। কো মো-জো-এর "Goddess" নামক কাব্যগ্রন্থ, "Rebellious Women" নামক নাটক এবং "Melancholy Songs of Shepherd" নামক উপন্যাস এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালের পর থেকে চীনের লেখকরা পুনরায় নূতনভাবে, নূতন আশায়, স্বাধীন চীনদেশ গঠনের নূতন সংকল্পে অনুপ্রাণিত হন। এই সময় চীনের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হোতে থাকে, এবং শ্রমজীবীশ্রেণীর সংগ্রামের আদর্শে অনেকে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করেন। ১৯২৫ সালের ৩রা মে তারিখে সাংহাই মিউনিসিপাল পুলিশ কর্ত্তৃক একজন শ্রমিক নিহত হবার পর চীনের সমস্ত প্রধান সহরে ধর্ম্মঘট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেই সময় কো মো-জো সর্ব্বপ্রথম চীনের নূতন তরুণ লেখকদের সম্বোধন কোরে বলেন: "প্রত্যেক শ্রেণীর নিজস্ব লেখক আছে। আমাদের সাহিত্য শ্রমজীবী-বিপ্লবের আদর্শে সঞ্জীবিত হবে। আমাদের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হবে, কলকারখানায় ঘুরতে হবে, বিপ্লবের জন্যে যারা প্রস্তুত হোচ্ছে তাদের সংস্পর্শে আসতে হবে। আমাদের এমন সাহিত্য গড়তে হবে যাতে নূতন চীনের নূতন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হয়ে উঠবে।" চৈনিক সাহিত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের এই হোলো সূচনা। ১৯২৭ সালে চীনে বহু বামপন্থী লেখকদের সঙ্ঘ গড়ে' উঠলো। ক্রমে দু'টি বামপন্থী সঙ্ঘ 'Sun' ও 'Wo' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চীনের বৃহত্তম তরুণ লেখকদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করল। ১৯৩০ সালে সমস্ত বামপন্থী লেখকদের নিয়ে একটি লীগ গঠিত হয়, লু হস্যুন হন তার চেয়ারম্যান্। এই লীগের উদ্দেশ্য হোচ্ছে, (১) পুরাতন আদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করা এবং লোকচক্ষুর সামনে বিদ্রূপ কোরে প্রকাশ করা; (২) নূতন সমাজের আদর্শকে সকলের সামনে তুলে' ধরা; (৩) নূতন সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করা। এই লীগের তত্ত্বাবধানে 'Bud', 'Story' ও 'Literature and the Masses' নামে তিনখানি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হোত। অনেক পুরাতন লেখকও এই সব পত্রিকায় লিখতেন, তবে যতটা সম্ভব পুরাতন খোলস ছেড়ে। এই সময় চীনের

-কয়েকজন অধ্যাপক বামপন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন জাতীয় সাহিত্যের কলরব তুলে। এঁরা সকলে ব্যক্তিগত বীরত্বের পক্ষপাতী, অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনের সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধন করাকে এঁরা এঁদের সাহিত্যের লক্ষ্য বোলে প্রচার করেন। এই পণ্ডিত অধ্যাপকচক্রের বিকৃত ব্যক্তিত্ববাদ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করে। কেতাবী পাণ্ডিত্যের বুলি কপচিয়ে এঁরা বেশী দিন এঁদের আদর্শকে জিইয়ে রাখতে পারেননি। ১৯৩২ সালে জাপান সাংহাই আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়, ১৯৩২ সালের আক্রমণের ঠিক পরে আর একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। এঁরা প্রচার করতে আরম্ভ করেন যে, সাহিত্য বা শিল্প হোচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর উপরে, এবং 'Contemporaries' নামক মাসিক-পত্রে এঁরা এই অদ্ভুত ল্যাজামুড়োবিহীন 'Super-class' সাহিত্য সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাপানী বর্ব্বরতার নাগপাশ তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের 'অতি-শ্রেণী'-সাহিত্য কোথায় যে বিলীন হয়ে যায় তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।*

চীনের এই সাহিত্যিক আন্দোলন থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় সঙ্কটের সময় দিকশূন্য আদর্শবিহীন মধ্যবিত্তশ্রেণী কিভাবে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ওঠানামা করতে থাকে, এ হোচ্ছে তারই নিদর্শন। কখনো ডাহিনে, কখনো বামে, কখনো বা নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে অবস্থান করা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধর্ম্ম, অথচ গলাবাজি কোরে, পাণ্ডিত্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে সকল সময় নেতৃত্ব গ্রহণের কদর্য্য প্রচেষ্টা এই শ্রেণীই কোরে থাকে। চৈনিক সাহিত্যে মাঝে মাঝে যে ভিন্নমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তা এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী দোটানা মনোভাবের জন্যে। কিন্তু এঁদের মধ্যেই যাঁরা নূতন আদর্শকে উপলব্ধি করেছিলেন,

* চীনের এই সাহিত্যিক আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবী ও প্রজ্ঞাবিলাসীদের মনোবৃত্তি ও শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলন ও অধ্যাপকবৃন্দের সংস্কৃতিসেবা ও সাহিত্যচর্চ্চা সুন্দরভাবে তুলনা করা যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের 'জ্যোতির্ম্ময়' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ধারণা হোতে পারে।

তাঁরা কখনো নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে সাময়িক বিপর্য্যয়ে বিচ্যুত হননি। জাপানী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ার চীনা কৃষকদের প্রাণপণ মুক্তির সংগ্রাম, মাঞ্চুরিয়ার প্রদেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করবার জন্যে নৃশংস জাপানীদের ব্যর্থ প্রয়াস, চীনের জাতীয় উন্নতির পথে বৈদেশিক পুঁজিবাদীদের প্রচণ্ড বাধা,—এই সব প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার বৈপ্লবিক মূর্ত্তি নূতন সাহিত্যিকেরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং করেছিলেন বোলেই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে তার সুন্দর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছিল। হসিয়াও চুন্-এর 'August Village' এবং হসিয়াও হুঙ্-এর 'Life and Death Field', মাঞ্চুরিয়ার চীনা জনগণের এই মুক্তি-সংগ্রামের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। মাও-তুন্-এর 'Twilight' ও 'Spring Silk-worms', বৈদেশিক ধনতন্ত্রের কবলে চীনের জাতীয় ধনতন্ত্রের বিনাশ-কাহিনী।

১৯৩৫-'৩৬ সালে চৈনিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হোতে থাকে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, এবং উত্তর চীনে তাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের শেষে সিয়ান্ ঘটনার পর চীনে জাপ্-বিরোধী সম্মিলিত মোহড়া গঠনের আন্দোলন সুরু হয়। এই নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চীনের নূতন সাহিত্যিকেরা নীরব থাকতে পারেননি। মাও তুন্ এই সময় নূতন সাহিত্যিকদের আহ্বান কোরে বলেন ঃ "আমাদের নূতন সাহিত্য হবে জীবন এবং জাতিকে রক্ষা করবার সাহিত্য। এই সাহিত্য চীনবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়গান গাইবে, কিন্তু বিকৃত বীরত্বের দামামা বাজাবে না। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ সেখানে ব্যক্ত হবে, কিন্তু সেই বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে উদ্ধত জাতীয়তার রূপ সেখানে প্রকাশিত হবে না। শত্রুর সৈন্যদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকবে। যারা নিজেদের জীবন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিনয় করে, তাদের এই অভিনয়ের মোহ ভেঙে দিয়ে বাস্তব সম্বন্ধে তাদের সজাগ করতে হবে। শত্রুর কাছে যারা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করবে, বশ্যতার ইঙ্গিত জানাবে, তাদের আমরা নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করব, জনগণকে উদ্বুদ্ধ কোরে তাদের সংহারের পথ সুগম কোরে দেব। তাহোলে আমরা হব নূতন চীনের প্রতীক।" তারপর ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে চীন-জাপান যুদ্ধ

আরম্ভ হবার পর থেকে চীনের সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিগত মতভেদ সাময়িক বিস্মৃত হয়ে চীনের মুক্তি-সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। লেখকদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে নিয়মিতভাবে "Literature and the War of Resistance", "Chinese Writers", "On the Literary Front" প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ কোরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার, চীনের শক্তিকে সংহত করবার চেষ্টা করা হোচ্ছে। চীনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা চীনের গরিলাবাহিনীর চাইতে চীনের এই লেখকরা মুক্তি-সংগ্রামে কোনো অংশে নিকৃষ্ট সৈনিক নন।

বিশুদ্ধমার্কা শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বলবেন, যে পৌরুষহীন সাহিত্য শত্রুর বিরোধিতার জন্যে সকলকে উৎসাহিত করে, সে-সাহিত্য সাময়িক উত্তেজক হিসাবে গণ্য হোতে পারে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্য নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যের যে-উৎস মানবতা বা 'Humanism', এই শ্রেণীর উত্তেজক সাহিত্য শত্রুর সংহারের প্রতিদানে প্রতিসংহার প্রচার কোরে তাকে বর্জ্জন করে, এবং শুদ্ধ সাহিত্যের উচ্চ রাজসিংহাসন থেকে মাটিতে নেমে আসে। অতএব সাম্প্রতিক চীনের সাহিত্য আর যাই হোক সাহিত্য নয়। আমরা বলি সাম্প্রতিক চীনের সাহিত্যের উৎস 'মানবতা' বা Humanism এবং সাম্প্রতিক চীনের সাহিত্য জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো প্রচার করে (হ্যাঁ, প্রচারই করে) 'Man, defend thyself! Man, conquer thy enemy,' এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো তারও বাণী হোচ্ছে 'Life will assert itself.' যে-সাহিত্য বা শিল্প সমাজ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে নিরালম্ব বিশ্ব-মানবতার দরদ প্রকাশ করে, নাকীকান্নাকে মানবহৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তি বোলে ঘোষণা করে, সে-সাহিত্যের বা শিল্পের 'Humanism' হোচ্ছে 'Philistinism'-এর নামান্তর। এ-যুগের 'Humanism' বা মানবতা, অর্থাৎ 'Proletarian Humanism,' ম্যাক্সিম্ গোর্কির ভাষায়, "does not pronounce grandiloquent and sweet phrases of love for mankind. The task of Proletarian humanism does not demand lyrical declarations of love; it demands from

each worker a consciousness of his historic mission of his right to power...Proletarian humanism demands an undying hate of philistinism, of the capitalist rule and its lackeys, of parasites, of the fascists and executioners, of the traitors to the working class ; hatred for all that causes suffering and all who live by the sufferings of hundreds of millions of people."

এই মানবতায় অনুপ্রাণিত হয়ে চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্যিকেরা একদিকে যেমন চীনের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীকে মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম করছেন, তেমনি আর একদিকে চীনের নূতন সাহিত্যের ভিত্তি গঠন করছেন। মুক্ত ও স্বাধীন চীন তাঁদের চীনের গণসাহিত্যের অগ্রদূত বোলে ভবিষ্যতে অভিনন্দন জানাবে।

সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা

আজ থেকে একশ' বছর আগে আমাদের চিন্তাধারা যা ছিল, এখনকার সঙ্গে তার অনেকখানি ব্যবধান। আজ মানুষের চিন্তার স্রোত ভিন্ন খাতে বইছে, কারণ আগেকার তুলনায় এখন আমাদের দৃশ্যমান বাস্তব জগতেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে অনেক। আমাদের চিন্তার উৎস বাইরের এই পৃথিবী, যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি। সুতরাং পৃথিবীর রূপ বদলালে মানুষের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানবসভ্যতার রূপ বদলে দিল। শিশু ধনতন্ত্র যৌবন পেল বৈজ্ঞানিকদের কাছে। যৌবনের মাদকতায় প্রসারণের যে প্রবৃত্তি জাগলো ধনতন্ত্রের, তার পথ সুগম কোরে দিল বিজ্ঞান দেশ থেকে দেশান্তরের, বন্দর থেকে বন্দরের, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের দূরত্ব ঘুচিয়ে। যৌবনে দীক্ষিত হয়ে ধনতন্ত্র যে নাম গ্রহণ করল তাই হোলো সাম্রাজ্যবাদ। পুঞ্জীভূত ধন বাণিজ্য-বিলাসীকে অনুপ্রাণিত করল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে কাঁচামাল সন্ধানের জন্যে, বাজারের জন্যে, যেখানে কলকারখানা-জাত পণ্যদ্রব্য বিকোবে, আর মোটা মুনাফার অংশে মেদবৃদ্ধি হবে সঞ্চিত ধনের। বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ্ আর তার পিছু পিছু মার্কিন ধনিকগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীব্যাপী। কেউ জংলী আফ্রিকানদের, অমানুষ নিগ্রোদের, কেউ অহিফেন্-প্রিয় চীনাদের, অসভ্য ভারতবাসীদের, এমনিভাবে প্রত্যেক স্থানে সভ্যতার আলোক দানের ভার নিল। ভগবান যিশুর বরপুত্রেরা সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে ছুটলেন দিক্‌বিদিকে, সঙ্গে রইল গোলাগুলি, বারুদ, কিরীচ। তারপর আরম্ভ হোলো সভ্যতা গঠনের ইতিহাস, মর্ম্মান্তিক ও রোমাঞ্চকর, এই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ইতিহাস। যুদ্ধের পর যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল, মানুষের হাহাকার আকাশ বিদীর্ণ করতে চাইল, কিন্তু সেই ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার

নাকীকান্না এখনো থামল না। মরণকান্নার তীব্র সুর ধ্বনিত হোলো ফ্যাশিজম্-এর মধ্যে, টুঁটি টিপে মারতে চাইল নিজেরই কঙ্কালসার অভিন্নসত্তা সাম্রাজ্যবাদকে। সাম্রাজ্যবাদ আর নয়া-সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্র হোলো পৃথিবী। সেই শোণিতযজ্ঞের নৈবেদ্য হোলাম আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা, পীড়িত আর শোষিত ফাঁপা মানুষের দল।

সভ্যতার প্রসারিত জালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী এইভাবে জড়িয়ে পড়ল, কোনো নির্জ্জন দ্বীপও রেহাই পেল না। বিলেতের স্টক্ এক্সচেঞ্জের মন্দার বাজার এল, কিন্তু দেখা গেল 'সাত সমুদ্র তের নদী' ডিঙিয়ে কলকাতা আর বোম্বের স্টক্ এক্সচেঞ্জে তার প্রতিক্রিয়ায় চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। ক্যানাডার অপর্য্যাপ্ত গম পুড়িয়ে ফেলা হোলো মূল্য ঠিক রাখবার জন্যে, অথচ দেখা গেল যে বলকানের কৃষকেরা দুর্ভিক্ষে মরছে, ঘরে তাদের আহার নেই। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধল রাজায় রাজায়, কোটী কোটী টাকা অজস্র ধারায় অস্ত্রকারখানায় উবে গেল, কিন্তু দেখা গেল বাংলাদেশের বা বিহারের কোনো সুদূর পল্লীতে বুভুক্ষার আগুন জ্বলেছে, আর কলিকাতা মহানগরীর পৌরজনের শিক্ষা ও সভ্যতাকে মুখ ভেংচে কর্পোরেশনের অভুক্ত শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছে। লিথুয়ানিয়ার হাজার হাজার শ্রমিকেরা শোভাযাত্রা কোরে গিয়ে নিজেরা শাসনভার দাবী করল, উক্রেইন্-এর কৃষকেরা সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করল লাল ফৌজকে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বোম্বের কোটীপতি কোনো গোবিন্দবল্লভ জেঠিয়া দু'লক্ষ টাকা যুদ্ধের তহবিলে দান কোরে দিয়েছেন এবং সহরের বেকার-বিকারগ্রস্ত মেরুদণ্ডহীন যুবকবৃন্দ দৈনিক কয়েক আনার লোভে ফুটপাথে পায়চারি করছে। এই সব আপাতবিরোধী ঘটনার মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র নেই? বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক্-এ যা ঘটছে, কলকাতা, বোম্বে, চুংকিং আর জামাইকাতে তার যা প্রতিক্রিয়া হোচ্ছে তা কি সবই নীরেট লজিসিয়ান্দের 'কাকতালীয়' যুক্তি? কখনো না, অন্তত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞানে তাই বোলে থাকে।

এটুকু লিখবার প্রয়োজন ছিল তাঁদের জন্যে যাঁরা এখনো আমাদের দেশে

বিদ্রূপ কোরে বোলে থাকেন, "সোশ্যালিজম্-কম্যুনিজম্, ওসব এ-দেশের জন্যে নয়। ভারতবর্ষ আর্য্যদের দেশ, ঋষির দেশ, এ-দেশের সভ্যতা সব সভ্যতার জন্মদাতা। এই যে বিমান, বহু আগে রাবণ এতে চড়ে সীতাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। তারপর বোমা—ওসব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাস পড়ে' শেখা, আগ্নেয় অস্ত্র এ-দেশেই ছিল, এখনকার 'incendiary bomb'-এর সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই। অতএব, রঙ্গচিঙ্গার দল, ওসব সোশ্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্ এ-দেশে চল্‌বে না, রুষিয়াতে চলতে পারে, দরকার হোলে য়ুরোপেও চলুক, কিন্তু এখানে না।" এ-কথা আজকে সোভিয়েট্ রুষিয়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুন্‌লে হয়তো হাসবে, কিন্তু আমরা আজ শুধু তাঁদের ভক্তিভরে বলতে পারি টোলে ফিরে যেতে, গুরুর আশ্রমে, দু'একটা পণ্ডিচেরী বা সেবাগ্রাম এখন অন্তত কয়েকদিনের জন্যে এ-দেশেই মিলবে। আমরা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যতের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা যুক্তি, বুদ্ধি ও বাস্তব পরিবেষ্টনের সাহায্যে বুঝেছি যে এ-যুগের মানুষের আদর্শ সোশ্যালিজম্—এবং সে-আদর্শ আমরাও গ্রহণ কোরে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হয়েছি, কারণ আমরাও মানুষ এবং এ-যুগের মানুষ।

এছাড়া বাকি যাঁরা আছেন তাঁরা দেশভেদে নয়, যুক্তির দিক দিয়ে সোশ্যালিজম্-কম্যুনিজম্ স্বীকার করেন না। সুতরাং সোশ্যালিজম্-কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে যা লেখা হয়ে থাকে তার মধ্যে তাঁরা দুর্গন্ধ পান, তাঁদের ব্রহ্মরস সেবনে ব্যাঘাত ঘটে বোলে সোশ্যালিষ্ট-কম্যুনিষ্ট সাহিত্য তাঁদের মতে কুরুচিপূর্ণ, আর না হয় আগাগোড়া প্রোপাগ্যাণ্ডা। তাঁরা কেউ বিশুদ্ধ-মার্কা সাহিত্যরসিক, অমরাবতীর পারিজাত-বাগানে অনাবিল সৌন্দর্য্য-পিপাসু চাতক সব,—আবার কেউ স্থিত-স্বার্থের (Status Quo) জয়গান গাইলেই সে-সাহিত্যকে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিনিষেধের গোলকধাঁধা ঘুরিয়েও সৎসাহিত্য বোলে স্বীকার কোরে থাকেন। দ্বিতীয় দলকে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ফ্যাশিষ্ট বা ইম্পিরিয়ালিষ্টদের মুখোস্-পরা "পঞ্চম বাহিনী" (Fifth Column) বোলে বাতিল কোরে দিয়ে (কারণ তাঁদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন থাকা আমাদের কর্ত্তব্য) দ্বিতীয় দলের যুক্তির হাস্যকর শূন্যগর্ভতা

সম্বন্ধে আলোচনা করব। তাহোলে প্রশ্ন হবে প্রোপাগ্যাণ্ডা কি? সাহিত্য বা আর্ট কি?

প্রসিদ্ধ মার্কিন সাহিত্যিক ও সমালোচক জেমস্. টি. ফ্যারেল বলেছেন যে প্রোপাগ্যাণ্ডা হোচ্ছে "a method of conventionalising and epitomising thought and policy." সংক্ষেপে প্রোপাগ্যাণ্ডার এর চাইতে প্রাঞ্জল সংজ্ঞা আমার জানা নেই। ভাবকে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ কোরে তাকে লোকসমাজে প্রচলিত করা হোচ্ছে প্রোপাগ্যাণ্ডা। সাহিত্যের সঙ্গে প্রোপাগ্যাণ্ডার পার্থক্য এইখানে যে, সাহিত্য ভাবকে প্রকাশ করে ভাষার বিলাসিতার মধ্য দিয়ে, রূপে ও রঙে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে, কিন্তু প্রোপাগ্যাণ্ডার উদ্দেশ্য হোচ্ছে ভাবকে প্রকাশ করা দৈন্যের মধ্যে, রূপহীন রঙহীন নিরাভরণ দেহে। ভাব তাই সাহিত্যের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়ে অন্তরকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শে পুনরায় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে ভাব দানা বেঁধে দলাপাকিয়ে যায়, তাই তীরবেগে বাণের মতো যখন সে অন্তরে বিঁধে যায় তখন হয় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি, একরাশ বুদ্‌বুদের মতো ফুলে ফেঁপে সে অন্তর্ধান করে। মুগুর উঁচিয়ে কাজ করানোর মতো প্রোপাগ্যাণ্ডা মানুষকে কর্ম্মে উৎসাহিত করে, কিন্তু তাতে চোখরাঙানির আর ধমকানির মাত্রাই থাকে বেশী,—"হুকুম, করতে হবে", কতকটা এই ধরণের জুলুমের ভাব। সাহিত্যের উদ্দেশ্যও (আমরা বিশ্বাস করি) মানুষের কর্ম্মজীবনের প্রেরণা জোগানো, মানুষকে জীবন্ত করা, জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করা—কিন্তু ধমক দিয়ে বা "লগুড়েন" নয়, গায়ে হাত বুলিয়ে, ভুলিয়েভালিয়ে, বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রলুব্ধ কোরে, মুগ্ধ কোরে। সাহিত্য সেইজন্য দীর্ঘায়ু এবং প্রোপাগ্যাণ্ডা স্বল্পায়ু।

দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে হোলে ইহুদীদের নির্য্যাতনের কোনো বিষয় বেছে নেওয়াই ভাল, কারণ প্রোপাগ্যাণ্ডার খোরাক ইহুদীদের মতো বোধ হয় কোনো 'জাত'ই জোগায়নি। সকলেই জানেন যে ইহুদী নির্য্যাতন হিট্‌লারের নাৎসীবাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ও অবলম্বন। এই ইহুদী নির্য্যাতন সম্বন্ধে "Deutschland erwache" নামক (জার্ম্মানি, জাগো!) জার্ম্মান গীতিগ্রন্থে অনেকগুলি গান আছে। গানগুলির উদ্দেশ্য হোচ্ছে

জার্ম্মানদের মধ্যে ইহুদী-বিরোধী মনোভাব জাগানো। একটি গানের কয়েকটি লাইন আমি উদ্ধৃত করছি :

Every child laughs when it sees a jew,
The jew's nose and the legs are crooked.
He has thick and horrible lips
And he smells often of garlick
And the jews fill their huge stomach with round bread.

Therefore, oh jew, listen to a good advice.
You would do better to escape in time,
Afterwards it may be a bit too late
When Hitler deals out justice.

গানটি পড়লেই বোঝা যায় যে ইহুদী-বিরোধী ভাব এখানে কতো সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং সে-প্রকাশ কতো 'crude' ও ফ্যাকাসে। অবশ্য নাৎসী ঝটিকা-বাহিনীর উপযুক্ত গান স্বীকার করতেই হবে। এর ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া তড়িৎ-গতিতে হয়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়। একে বলে প্রোপাগ্যাণ্ডা। অথচ এই একই ইহুদী-বিরোধী বিষয় নিয়ে, প্রায় একই পরিবেষ্টনের মধ্যে একই উদ্দেশ্যে সেক্সপীয়র বহুদিন আগে তাঁর একখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। সেই "Merchant of Venice" নাটক আজও আমরা সকলে পড়ে' থাকি, তবে স্যার ওজাল্ড মোজলের বা তাঁর শিষ্যবর্গের মতো হয়তো পৈশাচিক উল্লাস আমাদের হয় না। রাণী এলিজাবেথের ইহুদী ডাক্তার লোপেজ্ বিষ প্রয়োগ কোরে রাণীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এবং সেইজন্য লোপেজ্-এর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে ইহুদী-বিরোধী মনোভাব ভীষণ উগ্র এবং তখনই সেক্সপীয়র জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যে এই নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। শাইলকের চরিত্রে মার্লোর "Jew of Malta"-র প্রভাব যতো নেই তার চাইতে বেশী আছে লোপেজ্-এর কাহিনীর প্রভাব, ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন ইহুদী-বিরোধিতার প্রভাব। তবু "Merchant of Venice" পড়ে' গোয়েবেলস্-এর মতো বলতে ইচ্ছা হয় না, "Jews are beasts"—

বরং ইহুদী সুদখোর শাইলকের কথা মনে হোলে হাইনের (Heine) মতো বলতে ইচ্ছা করে :

> At Drury Lane (theatre) a pale fair Briton, at the end of the Fourth Act, fell a-weeping passionately, exclaiming 'The poor man is wronged'. At Venice, wandering dream-hunter that I am, I found Shylock nowhere on the Rialto but towards evening I heard a sob that could come only from a breast that held in it all the martyrdom that for eighteen centuries had been borne by a whole tortured people. I seemed to know the voice, and felt I had heard it long ago, when in utter despair it moaned out 'Jessica, my child!'

একে বলে সাহিত্য। সেক্সপীয়র ও গোয়েবেলস্‌-এর মধ্যে যা পার্থক্য, সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যেও পার্থক্য ততখানি। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হবে কি না, এবং উদ্দেশ্যমূলক (Tendentious) সাহিত্য মাত্রই প্রোপাগ্যাণ্ডা কি না?

এ-প্রশ্নের উত্তর হোচ্ছে যে সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হোতে বাধ্য, উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য হোতে পারে না। "উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য" কথাটা আমার মনে হয় কথার খাতিরে কথা, বাক্যের বিলাসিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বীকার করলাম (তর্কের খাতিরে) যে শিল্পী সমাজ-সংস্কারক নন, তিনি সৃষ্টি করেন নিজের খেয়ালে, নিজের আবেশে। কিন্তু এই খেয়াল বা আবেশ কি আশমান থেকে আসে? স্বীকার করলাম না হয় যে আশমান থেকেই আসে, কিন্তু তিনি তাকে প্রকাশ করেন কেন? তাঁর সেই খেয়াল বা আবেশ রঙ বা ভাষার মারফৎ অন্যে জানুক এই কি তাঁর ইচ্ছা নয়? তাঁর সেই 'খেয়ালামি' অন্যের কাছে প্রকাশ করবার মধ্যে কি 'উদ্দেশ্য' নেই? সেটা কি তাহোলে 'খেয়াল-উদ্দেশ্যমূলক' সাহিত্য হবে না? যিনি ভগবৎ-প্রেম ব্যক্ত করেন, তিনি কি চান না যে তাঁর সেই ঐশী প্রেমভাব অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক? যিনি নিছক কল্পনার জাল বোনেন, তিনি কি প্রকাশ করতে চান না, সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা, এবং তাঁর অলীক কল্পনা-প্রীতি? এগুলো কি উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হবে না? ব্যর্থ প্রেমের নাকীকান্না যিনি কাঁদেন, সার্থক প্রেমে মশগুল্‌ হয়ে যিনি

ভ্রমরের গুঞ্জন শুনবেন আকাশে বাতাসে, যিনি কাতরাবেন "আল্লা হো আক্‌বর!" বোলে, "হে জগদীশ্বর!" বোলে, তাঁদের সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হবে না কেন? তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে এই "উদ্দেশ্যহীন"-শ্রেণীর সমালোচকদের যতো আক্রোশ সমাজ ও মানুষের প্রতি, এবং যে-সাহিত্য সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে কোনো 'মনোভাব' প্রকাশ করবে, সেই সাহিত্যই হবে উদ্দেশ্যমূলক, অর্থাৎ প্রোপাগ্যাণ্ডা। অতএব এই শ্রেণীর সমালোচকদের মতামত বিবেচ্য নয়।

সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হবেই, কারণ সাহিত্যে শিল্পীর মনোভাব ব্যক্ত হয়, এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী সেই মনোভাবকে জ্ঞাপন (Communicate) করতে চান পাঠকের কাছে। যেহেতু শিল্পী মানুষ, সেইজন্য তাঁর মনোভাব মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে হওয়াই স্বাভাবিক, এবং যেহেতু তিনি রবিনসন্ ক্রুসো নন সেইজন্য তাঁর ভাব সামাজিক হওয়াও স্বাভাবিক। আসল প্রশ্ন হোলো যে উদ্দেশ্য কিভাবে ব্যক্ত হবে? মিনা কাউট্‌স্কির (Minna Kautsky) রচিত একখানি উপন্যাস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ফ্রিড্রিশ এঙ্গেলস্ (Fredrich Engels) লিখেছিলেন:

> You evidently felt the need of publicly taking sides in this book, of proclaiming your opinions to the world... But I believe that the *tendency* should arise from the situation and the action themselves without being explicitly formulated...

উদ্দেশ্য থাকবেই, তবে সেই উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার ভঙ্গিমার মধ্যেই সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্ব্বোক্ত ইহুদী-বিরোধী নাৎসী কবিতার মধ্যে ইহুদী-বিরোধী মনোভাবকে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সোজাসুজি প্রকাশ করা হয়েছে, সেইজন্য গান ওখানে সাহিত্য হয়নি। কিন্তু শাইলকের চরিত্রকে সেক্সপীয়র নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই 'Merchant of Venice' সাহিত্য। সাহিত্যিক তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ যেসব নায়কনায়িকার অবতারণা করবেন, তারা জীবন্ত মানুষের মতো বিভিন্ন ঘটনার

ঘাতপ্রতিঘাতে ফুটে উঠবে, নূতন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে, নূতন নূতন আলোকপাত হবে তাদের চরিত্রে। তারা শুধু হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দেবে না, লেখকের লাউডস্পীকার হবে না, দাবার ঘুঁটি হবে না, জীবন্ত মানুষের মতো ঘটনার স্রোতে, জোয়ারভঁটায় ওঠানামা করবে, আর উদ্দেশ্যের অন্তর্প্রবাহ তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো হবে ক্ষীণ, কখনো খর, কিন্তু খেয়াল থাকবে যেন কূল ছাপিয়ে না ওঠে। তবেই হবে সাহিত্য।

অনেকে সোশ্যালিষ্ট সাহিত্য বা প্রোলিটেরিয়ান্ সাহিত্য যে প্রোপাগ্যাণ্ডা তার নজীর স্বরূপ রুষীয় "RAPP"-এর কথা (Russian Association of Proletarian Writers) উল্লেখ করেন। সমালোচক Max Eastman তাঁর "Artists in Uniform" নামক পুস্তকে এই অভিযোগই করেছেন। কিন্তু ইষ্ট্ম্যান্-এর বই পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি আমেরিকার কম্যুনিষ্ট পত্রিকা "New Masses"-এর সম্পাদকদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন, এবং নিজে ট্রট্স্কীপন্থী বোলে ষ্ট্যালিন্-এর কার্য্যকলাপের নির্ব্বিচারে কুৎসা রটিয়েছেন। তিনি "RAPP"-এর ভুলই দেখিয়েছেন, তার ভাল দিকটা দেখাননি। যেমন তিনি ইয়েসেনিন্ (Yessenin) ও মায়াকভ্স্কির (Maiakovsky) আত্মহত্যার কথা উল্লেখ কোরে বলেছেন যে "RAPP" এইভাবে সোভিয়েট্ সাহিত্যিকদের সর্ব্বনাশ করেছে। কিন্তু তিনি নেক্রাসভ্ (Nekrassov) বা গ্ল্যাড্কভ্ (Gladkov) প্রমুখ সোভিয়েট্ সাহিত্যিকদের বিষয় আলোচনা করেননি। মায়াকভ্স্কি বা ইয়েসেনিন্ নিজেদের বিকৃত অহং-সর্ব্বস্বতার জন্যে বিপ্লবের যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেননি, সুতরাং "RAPP"-এর চাপ না পড়লেও তাঁরা আত্মহত্যা করতেন। অবশ্য "RAPP" যে তাঁদের আত্মহত্যার পথ খানিকটা সুগম করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বোলে "RAPP"-ই যে তাঁদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী এ-কথা বলা যায় না। "RAPP"-এর একসময় যে "Destructive function" ছিল আজ তা নেই, কারণ আজ সোভিয়েট্ রুষিয়ার গঠনের যুগ, তাই "RAPP"-কে আজ তুলে দেওয়া হয়েছে। অতএব "RAPP"-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ কোরে সোভিয়েট্ সাহিত্য বা প্রোলিটেরিয়ান্ সাহিত্যকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বা কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়ঢাক বোলে

গালি দেওয়া অর্থহীন। বিশেষ কোরে আধুনিক সোভিয়েট্ সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের পরিচয় পেলে সে-কথা কেউ পুনরুল্লেখ করা মূর্খতার নামান্তর বোলেই মনে করবেন। তাছাড়া "Proletcult" সম্বন্ধে লেনিন নিজেই ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন, এবং "Bunk" বোলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেমন ম্যাক্সিম্ গোর্কি সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন যে বোল্‌শেভিক্‌রা গোর্কিকে সাংবাদিক হিসাবে বা প্রচারক হিসাবে প্রচুর কাজে লাগাতে পারেন, কিন্তু গোর্কি যখন বই লিখবেন তখন তাঁকে বিরক্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। ক্রুপ্‌স্কায়াও লেনিনের জীবনের এমনি একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা ছোট্ট হোলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একবার 'Youth Commune' পরিদর্শন করতে গিয়ে লেনিন তরুণ কম্যুনিষ্টদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা কি পড় ? পুশ্‌কিন্ পড় কি ?" একজন তরুণ কম্যুনিষ্ট খুব উল্লসিত হয়ে বলেছিল, "না—না—। পুশ্‌কিন্ তো বুর্জোয়া—আমরা পড়ি মায়াকভ্‌স্কি।" লেনিন হেসে বলেছিলেন, "তা পড়, কিন্তু আমার মনে হয় পুশ্‌কিনই ভাল।" এই হোচ্ছে লেনিনের মত, আর স্ট্যালিন্‌ও যে লেনিনের আদর্শ পরিত্যাগ করেননি তা আজকে সোভিয়েট্ রুষিয়ার সত্যকার সোশ্যালিষ্ট সাহিত্যিকদের প্রচুর স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য, এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি নূতন সোভিয়েট্ সংস্কৃতির শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যাঁরা সঠিক অবগত আছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন, কয়েকজন স্বার্থান্বেষী বা উদ্‌ভ্রান্ত সমালোচকের কটূক্তিতে তাঁরা বিচলিত হবেন না।

তাহোলে সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট সাহিত্য অন্যান্য ফিউড্যাল্ বা ক্যাপিটালিষ্ট সাহিত্যের মতো, অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের মতো এ-যুগেও উদ্দেশ্যমূলক হোতে বাধ্য, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্লীন থাকবে, মুখ বিকৃত কোরে তাকিয়ে থাকবে না, বিচিত্র পরিবেশের আলোছায়ায় সে-উদ্দেশ্য ছবির মতো সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। "Tendenz Literatur" ভিন্ন সাহিত্য হোতে পারে না, তবে সে-সাহিত্যের বিপদও আছে। সুদক্ষ শিল্পী না হোলে সে-সাহিত্য প্রোপাগ্যাণ্ডা হবে, সাহিত্য হবে না, এবং শিল্পীর প্রতিভা বা শক্তি এইখানেই বিকশিত হবে। এ-যুগের একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী সাহিত্যিক (কর্ম্মীও) আর্নষ্ট টলার (Ernst Toller)

তাঁর আত্মজীবনী "I was a German" নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়ে নিজের নাটকগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

> There is one form of tendentiousness which the artist must avoid, and that is to make the issue simply between good and evil, black and white. The artist's business is not to prove theses but to throw light upon human conduct. Many great works of art have also a political significance ; but these must never be confused with mere political propaganda in the guise of art. Such propaganda is designed exclusively to serve an immediate end, and is at the same time something more and something less than art. Something more because, at its best, it may possibly stimulate the public to action ; something less because it can never achieve the profundity of art,...... or as Hebbel puts it, 'rouse the world from its sleep.'

সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে এই পার্থক্যই পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। অন্তঃসারশূন্যতাই প্রোপাগ্যাণ্ডার বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য গভীরতা। প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে "উদ্দেশ্য" তাই মুখ্য, প্রকাশ-ভঙ্গি গৌণ ; সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ-ভঙ্গি, অর্থাৎ ভাষা, ঘটনা-গ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রণই মুখ্য, "উদ্দেশ্য" গৌণ। সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা দুই-ই উদ্দেশ্যমূলক হোলেও, দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটি। সোশ্যালিষ্ট সাহিত্যে মানুষ ও সমাজের প্রতি নূতন সোশ্যালিষ্ট মনোভাবই ব্যক্ত হবে, সোশ্যালিজম্-ই হবে দৃষ্টিকেন্দ্র, কিন্তু সোশ্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্ সাহিত্যের অপরিহার্য্য উপকরণগুলিকে ছাপিয়ে উঠবে না, ঘটনার আবর্ত্তে, চরিত্রের মুখর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতে সে-আদর্শ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ফুটে উঠবে। তবেই সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট সাহিত্যও, হেবেলের কথায়, পৃথিবীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে।

নূতন সমালোচনা

পৃথিবী, মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে যখন আমাদের ধারণার পরিবর্ত্তন হয় তখন এই পৃথিবীতে, এই সমাজের মানুষের সৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বিচার-রীতির পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের সমাজ থেকে রসপান কোরে মানুষের সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয় শতদলের মতো, এবং চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির মতো সাহিত্য তারই একটা অবিচ্ছেদ্য পাঁপড়ি, সংস্কৃতির সৌন্দর্য্যের পূর্ণতায় যার অবদান অস্বীকার করা যায় না। যখন মানব-সংস্কৃতির পূর্ণরূপ বিচার করবার চিরাচরিত রীতি আমরা ছেড়ে এসেছি, মানুষের সমগ্র জীবনেতিহাসকে দেখতে শিখেছি নূতন আলোয়, নূতন বিভায়, তখন সাহিত্যকেও বিচার করতে হবে নূতন রীতিতে, নূতন প্রতিমান দিয়ে তার সৌন্দর্য্য যাচাই করতে হবে, নূতন কষ্টিপাথরে তাকে পরীক্ষা করতে হবে। কারণ সাহিত্যকে পৃথক কোরে সংস্কৃতি নয়, সাহিত্যের শাখাকে ছিন্ন কোরে সংস্কৃতির মহীরুহ নয়, সাহিত্যকে ওতপ্রোতভাবে সংপৃক্ত কোরে সংস্কৃতি। মানুষ যখন আজ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোনো ভৌতিক যাদুকরের খেলার পুতুল নয়, বা অমর্ত্ত্যলোকের কোনো সর্ব্বময় জগদীশ্বরের ক্রীড়নক নয়, পৃথিবী যখন আজ ভাবের অভিব্যক্তি নয় এবং মানুষের ইতিহাস যখন পরমব্রহ্মের (Hegelian Absolute) ক্রমিক প্রকাশ নয়, তখন সাহিত্যকেও কোনো ভৌতিক বা অতিমানবীয় মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়, কারণ সাহিত্য কোনো ভৌতিক বা অতিপার্থিব ভাবকে প্রকাশ করে না। মানুষ এই পৃথিবীর মানুষ, এই জগতের বাস্তব প্রতিবেশে পালিত মানুষ, আদিম যুগ থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস তা মানুষের সংগ্রাম-মুখর অভিযানের কাহিনী এবং যুগে যুগে সাহিত্য মানুষের সেই যুগ-মনের, যুগ-অন্তরের অভিব্যক্তি। তাই প্রাচীন সাহিত্যের ধর্ম্ম-সঙ্গীত, বীরগাথা প্রভৃতিকে যেমন আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে

সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করব, তেমনি স্বীকার করব না যে সেগুলো দেবতার কাছে মানুষের নিষ্কাম মনের অর্ঘ্য, বরং বলব যে দেবতা এ-পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে, তিনি মাটিতে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, মানুষের সুখদুঃখে তিনি সমানভাবে অভিভূত হয়েছিলেন, মানুষের জীবনের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তিনি, তাই মানুষও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে। যুগের সে-মনোভাব জানতে হোলে তৎকালীন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে, তাহোলে সাহিত্যে দেবতা ও ধর্ম্মের আগমন আর বিস্ময়কর মনে হবে না, মনে হবে অবশ্যম্ভাবী। যুগের পর যুগ সাহিত্যের বিচার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল মানুষের যোগাযোগের ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করতে হবে, কারণ সাহিত্য যুগ-নিরপেক্ষ, জীবন-নিরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ বা পরিবেষ্টন-নিরপেক্ষ নয়, সমাজ, জীবন ও পরিবেষ্টন-সাপেক্ষ। আমাদের নূতন সমালোচনার এই হবে পরিপ্রেক্ষিত।

সমালোচনা কি সে সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতভেদ আছে প্রচুর। প্রত্যেকটি মত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, তবে মোটামুটি কয়েকশ্রেণীতে তাদের ভাগ করা যেতে পারে। কেউ বলেন সমালোচনা হবে ডিডাক্‌টিভ (Deductive Criticism), কেউ বলেন ইন্‌ডাক্‌টিভ (Inductive Criticism), কেউ Impressionistic Criticism-এর পক্ষপাতী, কেউ রসালোচনাকেই (Appreciative Criticism) যথার্থ সমালোচনা বলেন, আবার কেউ Aesthetic সমালোচনার সমর্থক। ডিডাক্‌টিভ সমালোচকদের কয়েকটি বাঁধাধরা মূলসূত্র আছে এবং তাই দিয়েই তাঁরা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করেন। এঁরা সাহিত্যকে গতিশীল বোলে মনে করেন না, কারণ যা গতিশীল ও জীবন্ত তাকে অপরিবর্ত্তনীয় কোনো নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায় না। ইন্‌ডাক্‌টিভ সমালোচকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোরে জানালেন যে, কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়মকানুনের প্রাচীর দিয়ে সাহিত্যকে বন্দী কোরে রাখা ভুল, এবং যে-সমালোচনা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য গতিশীলতাকে অস্বীকার করতে পারে, সে-সমালোচনা আর যাই হোক সাহিত্য-সমালোচনা নয়।

Impressionistic Criticism-এর অধিবক্তারা বলেন যে, 'ডিডাক্‌টিভ' ও 'ইন্‌ডাক্‌টিভ' এই দুই দলই একটা মারাত্মক ভুল করেন এই যে, সমালোচনার সময় তাঁরা মূল বিবেচ্য বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন। সেই মূল বিবেচ্য বিষয়টি হোচ্ছে যে, যে-সাহিত্য সৃষ্ট হোলো তা আমাকে কিভাবে ও কতখানি প্রভাবান্বিত করল। অর্থাৎ ব্যক্তির উপর সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াকেই এঁরা সাহিত্য বিচারের উপায় বোলে নির্দ্দেশ করলেন। কিন্তু এ-পথ অবলম্বনের বিপদ হোলো এই যে, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উপর সাহিত্যের বিচার করতে হোলে, বিচার না হয়ে বচসা হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্ম্মভাবাপন্ন যিনি, তিনি সাহিত্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের খোরাক খুঁজে না পেলে তাকে সাহিত্য বোলে স্বীকার করবার মতো কোনো যুক্তিকেই গ্রাহ্য মনে করবেন না। আবার রাজনৈতিক নেতা যিনি, তিনি তার মধ্যে তাঁর পার্টির শ্লোগানের প্রতিধ্বনি না শুনতে পেলে বলবেন সাহিত্য নয়, নিছক অর্থহীন বুজরুকি। "বিশুদ্ধ" রসিক কোনো উদ্দেশ্যের হদিশ্‌ পেলে বলবেন যে, সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়নি, জয়ঢাক পিটানো হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উপর সাহিত্যের মূল্য যাচাই করতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত হতাশাই পুরস্কার মেলে। যাঁরা রসালোচনা, অর্থাৎ Appreciative Criticism-এর পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন যে, ইন্‌ডাক্‌টিভ সমালোচনা ও ছায়ালোচনা দু'টিই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সমালোচনার দিক থেকে কোনোটাকেই সম্পূর্ণ বলা যায় না। ইন্‌ডাক্‌টিভ সমালোচনা ও ছায়ালোচনাকে একত্রিত কোরে রসানুভূতির পর্য্যায়ে এনে সেই অনুভূতি পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই সমালোচনার সার্থকতা। এঁরা বলেন যে, ব্যাখ্যা করা বা বিচার করাই শুধু সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়, রস গ্রহণ করা এবং সেই রস পরিবেশন করা সমালোচনার উদ্দেশ্য। সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরসকে উপলব্ধি কোরে তাকে সমসাময়িক পাঠকের কাছে ব্যক্ত করাই হোচ্ছে সমালোচকদের প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁরা Aesthetic সমালোচনা সমর্থন করেন, তাঁরা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করেন, পাঠকের মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখে এবং সেই প্রতিক্রিয়াকে নন্দনতত্ত্বের নিয়মানুসারে পরীক্ষা কোরে। আরিস্ততল্‌-এর (Aristotle) সময় থেকে এই সমালোচনা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আরিস্ততল্‌-এর

"Poetics" বা প্লেটোর "Dialogues" হোচ্ছে এই শ্রেণীর সমালোচনা। লংগিনাস্ (Longinus), চিচারো (Cicero), হোরেস্ (Horace), কুইন্‌টিলিয়ান্ (Quintilian), হেগেল (Hegel), লেসিং (Lessing), বার্ক (Burke), ফ্রেতাগ্ (Freytag) প্রভৃতি সমালোচকেরাও এই পথ অনুসরণ করেছেন।

এখানে প্লেটো ও আরিস্তত‌ল্-এর কাব্য বিচারের পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা উচিত। প্লেটো কাব্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন না, বলতেন যে, কাব্যের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার কোনো যুক্তি নেই। প্লেটোর এই ধারণার মূলে ছিল তাঁর আদর্শবাদী মনোভাব। বস্তুকে (Things) প্লেটো ভাবের প্রতিবিম্ব বোলে মনে করতেন, এবং ভাবকে যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত করবার মতো যে-বস্তুর সামর্থ্য নেই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যুক্তিকে প্লেটো স্বীকার করতেন না। কাব্যকে প্লেটো এই রকমের বস্তু বোলে মনে করতেন, সুতরাং তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। আরিস্তত‌ল্ ছিলেন ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী। বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের মনোভাব নিয়ে আরিস্তত‌ল্ কাব্যের অস্তিত্বকে সমর্থন করেছিলেন। কাব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা উচিত কি উচিত নয় সে-সম্বন্ধে আরিস্তত‌ল্-এর মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। কাব্যের অস্তিত্ব আছে, তবে কেমনভাবে আছে এবং থেকে তার ফল কি হোতে পারে এই ছিল আরিস্তত‌ল্-এর প্রশ্ন। এই বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ছিল বোলেই আরিস্তত‌ল্ সর্ব্বপ্রথম "শিল্পের খাতিরে শিল্প" (Art for Art's sake) এই যুক্তিকে অর্থহীন বোলে বাতিল কোরে দেন। তাঁর "Poetics"-এর প্রথমেই তিনি লেখেন :

> I shall speak of the art of poetry and of its various species, discussing the *function* of each kind, along with the *proper structure* of a poem and the *number* and *nature* of its parts. (Italics আমার)

এর মধ্যে কোনো কথাই উপেক্ষা করবার নয়—"Function", "Structure", "Number and Nature", প্রত্যেকটি কথা এখানে অর্থপূর্ণ। কাব্য কি বুঝতে হোলে তার ইতিহাস ও গঠন সম্বন্ধে জানতে হবে এবং

শুধু তাই নয়, তার ব্যবহার (Function) সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক আবারক্রম্‌বি বলেছেন:

> Aristotle's introductory sentence indicates, aesthetic investigation is exactly analogous with biological investigation. To know what poetry is, we must not only examine its organism: we must know what this organism can *do* in its natural habitat—the lives of human beings. We must know its function. But its function will be conditioned by the nature of its structure, and the parts out of which its whole structure is made. (Lascelles Abercrombie: Principles of Literary Criticism).

আরিস্ততল্‌-এর মতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সমবৃত্তিসম্পন্ন। কবিতা কি বুঝতে হোলে আমাদের কবিতারূপী জীবটিকে পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব কতখানি। তার গুণ বা ব্যবহার সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখা উচিত যে তার গুণ বা ব্যবহার নির্ভর করে তার আঙ্গিক গঠনের উপর। এইভাবে দার্শনিক আরিস্ততল্‌ প্রথম কাব্যের বৈজ্ঞানিক সমালোচনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর সমালোচনাকে Aesthetic সমালোচনা বলেছি, কারণ পাঠকের মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করল তাই দিয়ে সাহিত্যের উৎকর্ষ যাচাই করা এই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা কি সে সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বহু মতামত আছে। প্রত্যেক মতের বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে যে কোনোটির মধ্যেই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমালোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই, অর্থাৎ ইতিহাস যে গতিশীল, সে-ইতিহাস যে সামাজিক ইতিহাস এবং সাহিত্য যে যুগে যুগে তারই প্রকাশ, এই পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনাকে দেখা বা বিচার করা হয়নি। বিখ্যাত সমালোচক মিঃ সেণ্টস্‌বেরী পর্য্যন্ত "সমালোচনার" এমন জটিল পরিচয় দিয়েছেন যে সেই পরিচয় থেকে কোনো পরিপূর্ণ ধারণা করা সম্ভব নয়।

মিঃ সেণ্টস্‌বেরী বলেছেন ঃ

> Criticism is pretty much the same thing as the reasoned exercise of Literary Taste—the attempt by examination of literature, to find out what it is that makes literature pleasant, and therefore good,—the discovery, classification and as far as possible, tracing to their sources, of the qualities of poetry and prose, of style and metre, the classification of literary kinds, the examination and proving as arms are proved, of literary means and weapons, not neglecting the observation of literary fashions and the like.
>
> (G. Saintsbury: The History of Criticism. Vol I).

মিঃ সেণ্টস্‌বেরী সমস্ত রকমের সমালোচকদের থেকে কিছু কিছু মতাংশ গ্রহণ কোরে সমালোচনার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। এতবড় শক্তিমান সমালোচকের পক্ষেও ঠিক প্রাঞ্জলভাবে সমালোচনা কি ব্যক্ত করা সম্ভব হয়নি। সমালোচনা ও সমালোচনার ইতিহাস তিনি প্রধানত নিজের তীব্র ও গভীর রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের সাহায্যেই লিখে গিয়েছেন। ম্যাথু আর্ণল্ড (Mathew Arnold) এদিক দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর "Function of Criticism at the Present Time"-এর মধ্যে স্বীকার করেছেন যে সমালোচকের কর্ত্তব্য হোচ্ছে এ-পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও জ্ঞানের প্রচার করা—"to propagate the best that is known and thought in the world." "To propagate" অর্থাৎ প্রচার করার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি, কারণ শুধু সমালোচনার নয়, সাহিত্যেরও এই হোচ্ছে. প্রধান সামাজিক কর্ত্তব্য। ম্যাথু আর্ণল্ড-এর মতে সমালোচক হোচ্ছেন সমাজের "intellectual middleman"—যাঁর কর্ত্তব্য হবে "Producer" অর্থাৎ সাহিত্যিক ও "Consumer" অর্থাৎ পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময়ে সহায়তা করা। এর সঙ্গে মিঃ আর্ণল্ড-এর কাব্য সম্বন্ধে মতটিও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। মিঃ আর্ণল্ড বলেছেন যে, কাব্য হোচ্ছে "Criticisim of life", অর্থাৎ জীবনের সমালোচনা। আর্ণল্ড-এর কাব্য সম্বন্ধে এই অভিমত

বিশেষ প্রণিধেয় এইজন্য যে, 'সাহিত্য' ও 'সমালোচনার' মধ্যে যে আপাত-বিরোধী ভাব প্রচলিত ছিল তাকে দূর কোরে তিনিই তাদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করেন। সাহিত্যিকের জীবনে কোনোকিছুর অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়,—যেমন প্রেম, বিরহ, মৃত্যু, ইত্যাদি। আর্ণল্ড-এর মতানুযায়ী লেখক বা কবি সেই 'কোনোকিছুর' সমালোচনা করেন এবং জীবনের সেই সমালোচনা হয় কাব্য। তাহোলে শেষ পর্য্যন্ত আর্ণল্ড-এর যুক্তি হোচ্ছে এই—কাব্য হোলো সাহিত্য ; কাব্য জীবনের সমালোচনা ; জীবনের সমালোচনার অর্থ হোলো জীবনের কোনো-কিছুর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা ; সমালোচনার উদ্দেশ্য হোলো এই 'জীবনের সমালোচনাকে', অর্থাৎ 'প্রকাশিত অভিজ্ঞতাকে' পাঠকের কাছে প্রকাশ করা। স্থতরাং সমালোচনা ও সাহিত্য এক, এবং সমালোচকও সাহিত্যিক।

ম্যাথু আর্ণল্ড-এর সময় পর্য্যন্ত কোনো সমালোচকই সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ও শিল্পের যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মানুষের সংস্কৃতি ও সমাজের অবিচ্ছিন্নতার দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোতে থাকে। সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের (Sociology) ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমালোচনার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয় এবং যাথার্থ্যের দিকে পৌঁছয়। আমরা যে নূতন সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছি, সে হোচ্ছে এই সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন, অর্থাৎ মার্কসীয় সমালোচনা। মার্কসীয় দর্শন, সমাজনীতি ও ইতিহাস-ব্যাখ্যার উপর এই 'নূতন সমালোচনার' ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যণ্ডের ও আমেরিকার বহু নূতন সমালোচক নূতন ও পুরাতন সাহিত্যের উৎকর্ষ এই নূতন সমালোচনার পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার করেছেন ও করছেন। ইংল্যণ্ডের ক্রিষ্টোফার কড্‌ওয়েল, র‍্যালফ্ ফকস্, ষ্টিফেন্ স্পেণ্ডার, সেসিল্ ডে-ল্যুইস, ফিলিপ্ হেণ্ডারসন্, এড্‌ওয়ার্ড আপ্‌ওয়ার্ড এবং আমেরিকার গ্র্যান্‌ভিল হিকস্, জোসেফ ফ্রিম্যান, জেমস্ টি. ফ্যারেল্, ভি. এফ. ক্যালভার্টন প্রমুখ সমালোচকেরা এই 'নূতন সমালোচনার' পথ প্রদর্শক।

এই নূতন সমালোচনার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করবার পূর্ব্বে তার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। কার্ল মার্কস্ বলেন যে সমাজ হোচ্ছে গতিশীল এবং গতিশীলতার জন্যে যুগে যুগে ঐতিহাসিক আবর্ত্তের ভিতর দিয়ে মানুষের সমাজ সভ্যতার উন্নততর সোপানে আরোহণ করেছে। এর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়, কারণ মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার আঘাতে ও সংঘাতে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর বহির্জগতের এই ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। মানুষের এই ইতিহাস হোচ্ছে শ্রেণী-ইতিহাস, দাস-প্রভু, রাজা-প্রজা ধনিক-শ্রমিক ইত্যাদি। সুতরাং যদিও মানুষের জীবন আবেষ্টন-সাপেক্ষ এবং সেই আবেষ্টন বিচার কোরে গ্রহণ করবার স্বাধীনতা মানুষের নেই, কারণ সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে সব আবেষ্টনই পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত, তাহোলেও মানুষও নিজে তার আবেষ্টনকে পরিবর্ত্তন কোরে থাকে। মানুষ ও আবেষ্টনের পারস্পরিক সংগ্রামের ফলে দুয়েরই পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের চিন্তাকে এইজন্যই মার্কস্ "active historical agent" বলেছেন, এবং মার্কসীয় দর্শনকে মুখ্যত কর্ম্ম-দর্শন বা 'Philosophy of Action' বলা হয়ে থাকে।

মার্কস্-এর দর্শনকে কেন্দ্র কোরে নানা বিষয়ের সমালোচনা গড়ে' উঠেছে এবং তার থেকে শিল্প বা সাহিত্য সমালোচনাও বাদ যায়নি। কার্ল মার্কস্ নিজে অবশ্য পৃথকভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বা সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি, সামান্য যা মতামত তা তাঁর রচনার মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকলেও আমার মনে হয় তার থেকে সম্পাদনা কোরে মার্কস্-এর 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করা খুব শক্ত কাজ নয়। মার্কস্ অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে বৃহত্তম মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্যের সম্ভার-বৃদ্ধি বা সংস্কৃতির সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন সম্ভব নয়। সেইজন্য বেশী সামাজিক সমস্যা নিয়েই তিনি চিন্তা করেছিলেন। সামাজিক সমস্যার আলোচনার মধ্যে অন্যান্য সমস্যা যখন এসেছে তখন তিনি তাদের উপেক্ষা করেননি। কিন্তু অনেক প্রজ্ঞা-বিলাসীর ধারণা আছে যে যে-লোক 'Capital' লিখতে পারেন, 'Commodity price' ও 'Surplus value' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন,

আর যেকোনো বিষয় থেকেই হোক, অন্তত 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' বা 'সাহিত্য' থেকে কোনোদিন তিনি রস গ্রহণ বা উপলব্ধি করতে পারবেন না, এমনকি গ্রহণ করবার তাঁর অধিকারও নেই। কার্ল মার্কস্-এর 'Capital'-এর মধ্যেই যে প্রচুর সাহিত্যের ও শিল্পের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা এই সব সমালোচকদের নজরে পড়ে কিনা জানি না, তবে এঁরা 'সাহিত্য' বা 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হোলে সেখানে মার্কস্-এর যে 'প্রবেশ নিষেধ' একথা তালঠুকে বোলে থাকেন, ভাবটা এই যেন কোনো ষাঁড় তাঁদের সাজান পুতুল ভেঙ্গে তছনছ কোরে দেবে। বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টান্ত না দিয়ে আমি আমাদের বাংলাদেশের একজন প্রজ্ঞা-বিলাসী ও আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করব। জনৈক সমালোচক তাঁর প্রবন্ধ-পুস্তকের * মধ্যে 'সাহিত্যিকের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ' সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন, "কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্যক্ষেত্রে ত দূরের কথা। অবশ্য আর্থিক বৈষম্য ও সেই সঙ্গে শ্রেণী-বিরোধের ফলে সাহিত্যের রূপ খানিকটা নির্দ্ধারিত হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা দলাদলির পটভূমি কিংবা অবস্থান মাত্র।" "সাহিত্যক্ষেত্রে ত' দূরের কথা"—এই উক্তির মধ্যেই সমালোচকের আকাশস্পর্শী আত্মাভিমান ও অবজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এও বোঝা যায় যে শিল্প, সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মার্কসীয় বিচার সম্বন্ধে বাজারের যেটা মেকী ধারণা সমালোচকের তাই বিশ্বাস। এই অবজ্ঞা ও আত্মাভিমান ক্ষমার্হ কিনা পাঠকের বিচার্য্য, কিন্তু এরকম ভঙ্গিমাতে প্রকাশ করা যে অশিষ্ট সে-সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি নেই। শিল্পী সম্বন্ধে উক্ত প্রজ্ঞাবিলাসীর থিসিস হোচ্ছে এই : "মন ও বুদ্ধির কাজে জুয়াচুরি থাকবেই থাকবে—কেননা তাদের রাস্তা গলিঘুঁজি ; আত্মার বিকাশে জুয়াচুরি নেই, তার রাস্তা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মতই সোজা ও চওড়া। সাধারণ ব্যক্তির ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ এইখানে। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আত্মার বালাই নেই—কেবল দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে তার কারবার এবং আর্টিষ্টের কারবার দেহ, মন,

---

* চিন্তয়সি—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধি ও আত্মার সঙ্গে। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যে, সাধারণ ব্যক্তির মূলধন বুদ্ধি ও আর্টিষ্টের মূলধন আত্মা, অতএব যেন আর্টিষ্টের গড়নই আলাদা।" আর্টিষ্টের গড়ন সম্বন্ধে পাঠকের এখনো নিশ্চয়ই কোনো ধারণা হয়নি, তবে সমালোচক পরে ভাষার সাহায্যে আর্টিষ্টের এই মূর্ত্তি এঁকে দিয়েছেন। আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তাদের এক পা স্বর্গে, অন্য পা মর্ত্ত্যে। এক পা মর্ত্ত্যে রাখলে সাধারণ মানুষের অন্য পদটিকেও মর্ত্ত্যে রাখতে হয়, কিন্তু যারা নটরাজের নৃত্যের তালে তালে ছন্দ রাখতে পারেন, তাদের পক্ষে এ প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গিমা অসম্ভব নয়।" ভঙ্গিমাটা আমরা বুঝবার চেষ্টা করলেও প্রত্যক্ষদর্শনে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। কারণ রূপকথার দৈত্য নটরাজই হন বা আর যেই হন, তিনি মর্ত্ত্যে বিরাজ করুন এ আমরা মর্ত্ত্যের মানুষ ইচ্ছা করি না। আমরা দুই পা মর্ত্ত্যে রেখেই চলি এবং শুধু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মতো সোজা চওড়া রাস্তায় চলা আমাদের জীবন নয়, শিল্পীরও নয়। পাঠক এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সমালোচক সাহিত্য বিষয়ে মার্কস্‌-এর মতামত সম্বন্ধে কেন বলেছিলেন, "কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্যক্ষেত্রে ত' দূরের কথা।" এখন আমরা মার্কসীয় সমালোচনার রীতি যথাযথ বিচার করবার চেষ্টা করব।

অর্থনীতিক সমস্যাই যে সমাজের পরিবর্ত্তনের মূল ও মুখ্য কারণ একথা কার্ল মার্কস্‌ প্রমাণ করেছেন মানুষের ও জাতির ইতিহাস থেকে। সামাজিক বিপ্লব মুখ্যত এই অর্থনীতিক কারণেই সম্ভব হয়। কিন্তু কার্ল মার্কস্‌ এ-কথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন যেমন বৈজ্ঞানিক বিচারসাপেক্ষ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, আইন প্রভৃতির সেভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয়ও না এবং ধীরে ধীরে সচেতন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাদের যে-পরিবর্ত্তন হোতে থাকে তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার করা যায় না। কোনো শিল্পী, ভাস্কর বা কবি বীক্ষণাগারের মধ্যে তাঁর শিল্প বা সাহিত্যের রঙ, সুর ও ছন্দ পরীক্ষা করবেন, এ-প্রস্তাব মার্কস্‌-এর কাছ থেকে বিদ্রূপে জর্জ্জরিত হয়েই ফিরে আসত। এমনকি মার্কস্‌ এ-কথাও প্রসঙ্গত স্বীকার করেছেন যে, এমন

অনেক যুগ দেখা যায়, যখন শিল্পের সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হয়েছে সমাজের মূল বিকাশধারার সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না রেখেই। মার্কস্ গ্রীক শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, গ্রীক শিল্পের আদর্শগত বিষয় গ্রীক জীবনধারা থেকে গৃহীত বোলেই, শিল্প-ব্যবসা বা বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে সে-শিল্পের বা শিল্পাদর্শের পুনরাবির্ভাব সম্ভব নয়। এখানে মার্কস্ পুরাতনকে দিয়ে নূতনের বিচার, বা নূতনকে দিয়ে পুরাতনের বিচার এই দুই সমালোচনার রীতিকেই ভুল বোলে ইঙ্গিত করেছেন। তাহোলে সংক্ষেপে সাহিত্যের বা শিল্পের বিচার সম্বন্ধে মার্কস্-এর মত হোলো এই যে, শিল্প বা সাহিত্যকে তার আবির্ভাবের যুগের আবেষ্টনের মধ্যে বিচার করতে হবে এবং আবেষ্টন মুখ্যত অর্থনীতিক হোলেও সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক নয়, সেখানে অন্যান্য সমস্যা, এমনকি ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্খারও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়, কারণ এসব মিলিয়েই তবে মানুষের পূর্ণ ইতিহাস। ঠিক এই কথাই এঙ্গেল্স আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

> Men make their own history, whatever its outcome may be, in that each person follows his own consciously desired end, and it is precisely the resultant of these many wills operating in different directions and of their manifold effects upon the outer world that constitutes history. Thus it is also a question of what the many individuals desire. The will is determined by passion or deliberation. But the levers which immediately determine passion or deliberation are of very different kinds. Partly they may be external objects, partly ideal motives, ambition, 'enthusiasm for truth and justice,' personal hatred or even purely individual whims of all kinds. (Marx-Engels Selected Correspondence No. 213)

সুতরাং শুধু অর্থনীতি দিয়ে শিল্প ও সাহিত্যের বিচার সম্বন্ধে মার্কস্-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে, সে-অভিযোগ যেমন অর্থহীন প্রলাপের সামিল, মার্কস্ সম্বন্ধে পুরাতনের প্রতি অবজ্ঞার যে-আতঙ্ক

সমালোচক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তাও ভুয়ো এবং মস্তিষ্কের উত্তাপজনিত কল্পনা বলা চলে। এইবার মার্কসীয় সমালোচনা-পদ্ধতির দু'একটা দৃষ্টান্ত দেব।

পূর্ব্বে বলেছি যে প্লেটো কাব্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন না এবং আরিস্ততল্ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মার্কসীয় সমালোচক প্লেটোকে কটূক্তি কোরে, আরিস্ততল্‌কে যে সামান্য কিছু সমর্থন করবেন তা নয়। তিনি বলবেন যে, কোনো বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় কোনো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মনোভাবের অভিব্যক্তি প্লেটোর এই কাব্যাদর্শের মধ্যে পাওয়া যায়। দাস-প্রভুর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কাব্য বা শিল্পচর্চ্চার সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদন-রীতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, অবসরবিনোদন হিসাবেই কাব্য ও শিল্পের সাধনা করা হোত। চিন্তাধারা শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ মাত্রেই সরলগতিতে অগ্রসর না হয়ে বক্রগতিতে অগ্রসর হয়, এবং আভ্যন্তরীণ বিরোধকে অতিক্রম করতে না পেরে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাবর্ত্তের মধ্যে কখন নিমজ্জিত হয়, কখন পুনরায় ভেঙেচুরে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণের জন্যে অর্থাৎ সমস্ত কিছুকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করবার জন্যে কখন যান্ত্রিক উপায়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ করা হোত, আবার কখন আদর্শবিলাসী মন সেই গণ্ডি অতিক্রম কোরে প্রতিপন্ন করত যে পরিবর্ত্তন, গতি প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অসম্ভব। আরিস্ততল্ ছিলেন এই যান্ত্রিক বিশ্লেষণের উদ্যোক্তা এবং বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম আনুমানিক সত্য প্রতিষ্ঠার সময়ে এই আরিস্ততেলীয় মনোভাবের আবশ্যকতা ছিল; প্লেটো ছিলেন আদর্শবাদের অধিবক্তা। আরিস্ততল্-এর কাব্য বিচারে তাই কাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নের সাক্ষাৎ না পেয়ে আমরা তার 'function', 'structure' ও 'nature' সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাই, আর প্লেটোকে দেখতে পাই কাব্যকে অস্বীকার করছেন, কারণ ভাবের বাহন হিসাবে তার পৃথক অস্তিত্বের কোনো যুক্তি নেই। দু'য়েরই মূলে শ্রেণীবিন্যস্ত গ্রীক সমাজ, দাস-প্রভুর পারস্পরিক আকাশ-মাটি ব্যবধান।

এই বিচার পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যেও প্রযোজ্য। যেমন ইংল্যণ্ডের

কাব্যের রোমান্টিক আন্দোলন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংল্যণ্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল মনার্কির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং ইংল্যণ্ডের তৎকালীন টোরী গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়। এই সময়কার লেখকদের বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায় এবং এই সহানুভূতি এতো গভীর হয় যে রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য-সমালোচনা পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়। সাদে (Southey) কোল্‌রিজ্ (Coleridge), ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রমুখ তরুণ লেখকরা তখন টম্ পেইন্-এর (Tom Paine) "Rights of Man" এবং উইলিয়াম্ গড্‌উইন্-এর (William Godwin) "Political Justice" পড়ছেন। তা ছাড়া রুস্যোর আদর্শের আকর্ষণও কম ছিল না। রুস্যোর (Rousseau) আদিমতা (Primitivism), ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) এবং কল্পনা রোমান্টিক কবিদের মুগ্ধ করেছিল। আদিম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, "দাও ফিরে সেই অরণ্যের" আহ্বান রোমান্টিক কবিদের কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেনি। ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কোল্‌রিজ ও সাদে যে-আন্দোলন আরম্ভ করেন, নাগরিক বহিরাশ্রয় ও বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে সেই আন্দোলন ক্রমে সমগ্র সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহকে বাণী দেন বাইরন (Byron) ও শেলী (Shelley)।

বিদ্রোহের প্রতিমূর্ত্তি হোচ্ছেন বাইরন, সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কোরেই যাঁর মুক্তি, কোনো পথের সন্ধান নেই, আকাঙ্খা নেই, শুধু নির্ম্মম শ্লেষাঘাত ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করাই ছিল যাঁর গুণ। শেলী বিদ্রোহী হোলেও তিনি টম পেইন্ ও গড্‌উইন্-এর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে রাজনীতিকদের মতো তাঁর কোনো সঠিক পরিকল্পনা না থাকলেও শুধু ধ্বংসের মধ্যেই তাঁর মন শান্তি পেত না। শেলী এমন এক রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করতেন যেখানে মানুষের স্বাভাবিক সততা স্ফূর্ত্তি পাবে বিকাশের, এক কথায় শেলীর ছিল তাঁর নিজেরই রচিত 'West Wind'-এর মতো অন্তর ও আদর্শ, 'Destroyer' ও 'Preserver' এবং বোধ হয় কার্ল মার্কস্ সেইজন্যই শেলীকে প্রকৃত বিপ্লবী কবি আখ্যা দিয়েছিলেন।

কার্ল মার্কস্-এর জীবনীতে মেরিং লিখেছেন :

> Referring to Byron and Shelley...he declared that those who loved and understood these two poets must consider it fortunate that Byron died at the age of 36, for had he lived out his full span he would undoubtedly have become a reactionary bourgeois, whilst regretting on the other hand that Shelley died at the age of 29, for Shelley was a thorough revolutionary and would have remained in the van of socialism all his life.
>
> (Karl Marx—By Franz Mehring).

তাহোলে দেখা গেল যে, মার্কসীয় রীতিতে সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা ও আবেষ্টনের আলোকে শিল্প ও সাহিত্যের সমালোচনা করা যেতে পারে, এবং সে-সমালোচনাতে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে না, বরং সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে শিল্প ও সাহিত্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্য আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। গ্রীক শিল্প ও গ্রীক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ-মার্কা রসিকেরা যেভাবে নন্দনশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের কসরৎ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবেন তা থেকে শুধু কয়েকজন বিশুদ্ধ বায়ুগ্রস্ত রসিকই হয়তো আনন্দ উপভোগ করবেন, আর সকলে না-বোঝার বা ভুল বোঝার স্বাভাবিক আনন্দে মশগুল্ হয়ে থাকবে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী, কোল্‌রিজ, বাইরন প্রভৃতি কবির কাব্যালোচনা শুধু রসশাস্ত্রের বা অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্যে করলে যেমন তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে, তেমনি বৃহত্তম পাঠকগোষ্ঠীর প্রতি যে অন্যায় করা হবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সব পণ্ডিত বা রসিক সমালোচক এঁদের কাব্য রোমান্টিক বলবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিসিজম্ কাকে বলে তার এক সুদীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করবেন, কিন্তু কেন এঁরা 'রোমান্টিক' ছিলেন সে-প্রশ্নের জবাব তাঁদের সমালোচনাশাস্ত্রে মিলবে না। সে-প্রশ্নের জবাব দিতে হোলে এই সব কবি যে-যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন, তাঁদেরকে সে-যুগের মানুষ ভাবা প্রয়োজন, (অতি-মানুষ, ভূত বা দেবতা নয়) এবং সেই ইতিহাসের আলোয় এঁদের মানুষিক অন্তরের ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিচার করা প্রয়োজন।

সে-বিচার যেমন কবিদের দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত হবে, তেমনি পাঠকদের দিক দিয়েও বোধগম্য হবে। এই বিচারকে মার্কসীয় সমালোচনা বলা হয়। এই নূতন মার্কসীয় পদ্ধতিতে সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। ইংরেজী কাব্যের আলোচনা করেছেন ক্রিষ্টোফার কড্‌ওয়েল্ তাঁর "Illusion and Reality"-র মধ্যে, এবং ইংরেজী উপন্যাসের আলোচনা করেছেন র‍্যালফ্ ফকস্ তাঁর "The Novel and the People"-এর মধ্যে। এ ছাড়া ফিলিপ্ হেণ্ডারসন্, ষ্টিফেন্ স্পেণ্ডার, জন্ ষ্ট্র্যাচি, ডে-লুইস্ এঁরাও কিছু কিছু পুরাতন ও সাম্প্রতিক সাহিত্যের আলোচনা করেছেন মার্কসীয় রীতিতে। আমেরিকাতেও এই সমালোচনা সম্প্রতি আরম্ভ হোলেও বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে বলা চলে। মার্কিন লেখকদের মধ্যে গ্র্যানভিল্ হিক্‌স্, জেমস্ টি ফ্যারেল্, জোসেফ্ ফ্রিম্যান্, ভি এফ্ ক্যালভার্টন্ এঁদের নামই এই নূতন সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্যারেল্-এর "A Note on Literary Criticism," ফ্রিম্যান্-এর "American Testament"-এর মধ্যে কিছু কিছু, ক্যাল্‌ভার্টন্-এর "The Newer Spirit", "The Liberation of American Literature,"— মার্কসীয় সমালোচনা-সাহিত্যে মূল্যবান অবদান বলা যায়। এর মধ্যে সামান্য কিছু মতদ্বৈধ থাকলেও তা মার্কসীয় সমালোচনার নূতন রীতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা নিয়ে, মূল বিষয়বস্তু নিয়ে নয়। এই নূতন সমালোচনার কিছু দৃষ্টান্ত দেব।

কড্‌ওয়েল্-এর মূল কথা হোচ্ছে যে বাস্তব বা Reality শুধু বস্তু নয় বা মনও নয়, এ দু'য়ের সক্রিয় দ্বন্দ্বমূলক সম্বন্ধ এবং সত্য বা Truth হোচ্ছে বস্তুর সঙ্গে মনের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই অবিচ্ছিন্ন বিরোধ ও মিলনের ফল। এই হোচ্ছে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের (Theory of Knowledge) মর্ম্ম কথা। এই জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে কড্‌ওয়েল্ নূতন কোরে ইংরেজী কাব্যের ইতিহাস লিখেছেন, কাব্যের প্রাণ সন্ধান করেছেন এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। যেমন কড্‌ওয়েল্ বলেছেন যে, সেক্সপীয়র তাঁর ট্রাজেডির মধ্যে যে বিরোধ দেখিয়েছেন তা পরে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বোলে জানতে পেরেছি—ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে সমসাময়িক কঠিন

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধ। এঙ্গেলস্ বলেছেন যে প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি হোচ্ছে স্বাধীনতা—Freedom is the recognition of necessity—এবং যেহেতু হ্যাম্‌লেট্, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো বা কিঙলিয়র কারো মধ্যে এই স্বীকৃতি নেই সেইজন্য তাদের ·পরিণামও ট্র্যাজিক। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন সমালোচক ক্যালভার্টন্ তাঁর "Newer Spirit"-এর মধ্যে বলেছেন :

> When it is said that... Shakespeare is the greatest writer in the world because his knowledge of human nature was so various or profound, or because he was the master of such sublime thought, what we in casual terms have said is that Shakespeare came into contact with those stimuli, those experiences if you will, that, reacting on his nature, could but inevitably make him the man and author he was.

সুতরাং কোনো শিল্পীর বা সাহিত্যিকের রচনা বা শিল্প বিচার করতে হোলে শুধু প্রতিভার জৌলুষে ধাঁধিয়ে থাকলে চলবে না, সেই প্রতিভা কোন আবেষ্টন 'থেকে প্রেরণা ও উদ্দীপনা পেয়েছে, অভিজ্ঞতালাভের সুবিধা পেয়েছে বিচার করতে হবে। মিঃ ফ্যারেল মার্কসীয় সমালোচনার বিরুদ্ধে যে কয়েকটি অভিযোগ আছে সেগুলিকে উগ্রপন্থীদের ত্রুটি বলেছেন, এবং খণ্ডন করেছেন। এই ত্রুটি শুধু উগ্রপন্থীদেরই নয়, প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচকদেরও বিকৃত ব্যাখ্যা বলা চলে। পুরাতনকে দিয়ে নূতনের বিচার বা নূতনকে দিয়ে পুরাতনের বিচার মার্কস্ যে নিজেই কোনোদিন অনুমোদন করেননি একথা পূর্ব্বে বলেছি। সমসাময়িক আবেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক যুগের শিল্প ও· সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা যাচাই করবার জন্যে কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রতিমান মার্কস্ দিয়ে যাননি, এবং শিল্পের তুলনামূলক সমালোচনা যে ভুল তা মার্কস্ই স্পষ্ট ইঙ্গিত কোরে গিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক যুগে বা সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্য বোলে তা যে সমাজতান্ত্রিক যুগের তুলনায় অপাংক্তেয় বা অপকৃষ্ট হবে, এমন কথা প্রতিপন্ন করাকে মার্কস্ মূর্খতা বোলেই ভাবতেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে মার্কস্-এর মতামত বিবেচনা করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

আর আবেষ্টন বলতে মার্কস্ যে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দিকটাই দেখতেন একথা যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা মার্কস্-এর ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার সঙ্গে পুরাপুরি পরিচিত নন। অর্থনৈতিক কারণ, অর্থাৎ উৎপাদন-প্রণালী ও উৎপাদন-সম্বন্ধ যে মূল কারণ ও শক্তি এ-সত্য মার্কস্ প্রমাণ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন ছিলেন না। বিশেষ কোরে সেই সব সমস্যার সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ কি তাও তিনি বোলে গিয়েছেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে মার্কস্ অর্থনৈতিক বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি দিয়ে শিল্প বা সাহিত্যের বিচার করতে নারাজ। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় অজ্ঞতাপ্রসূত।

এই হোলো 'নূতন সমালোচনা' অর্থাৎ মার্কসীয় সমালোচনার রীতির পরিচয়। এ-সমালোচনার মধ্যে 'আত্মা' নেই, 'নটরাজ' নেই, 'বিশুদ্ধ' অমৃতরস নেই—এর মধ্যে আছে মানুষের দেহ ও মন, পৃথিবী ও সমাজ, মানুষের শিল্প ও সাহিত্য। অবশিষ্ট যা তা মানুষের নয়, সমাজের নয়, সুতরাং মার্কসীয় সমালোচনারও অন্তর্ভুক্ত নয়।

বাংলা সমালোচনা

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পিছনে একশত বৎসরেরও বেশী দিনের ইতিহাস থাকলেও, সে-ইতিহাসের অনেকখানিই উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন সংবাদপত্র "Friend of India" ও "সমাচার দর্পণে" মধ্যে মধ্যে যে পুস্তক-পরিচয় প্রকাশিত হোত তাকে সাহিত্য-সমালোচনা বলে না। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্ভার সমৃদ্ধ হোলেও সেগুলির প্রকৃত সমালোচনা, সংস্কৃত রসশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্রের দিক দিয়েও খুব বেশীদিন আরম্ভ হয়নি। বাংলা উপন্যাস, বাংলা কবিতা, বাংলা ছোটগল্প তখনো জন্মলাভ করেনি, কারণ যে সামাজিক ভূমিতে সাহিত্যের এই তরুলতা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হোতে পারে সে-ভূমি তখনো অনুর্ব্বরই ছিল। বোধ হয় এইজন্যই একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত বাংলা সমালোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মেলে না, এবং গ্রামে গ্রামে যে গ্রাম্যগীতি ধ্বনিত হোত, বা রাধাকৃষ্ণের যে অমর্ত্ত্য প্রেমকাহিনী বৈষ্ণব কবিরা ভাববিহ্বল সুরে ও ছন্দে রচনা করতেন তা শুধু ভাবতন্ময় রসিকের অজস্র অশ্রু-ঝরানিতেই শেষ হয়ে যেত। অন্তরের ভাব বাষ্প হয়ে জমতো চোখের কোণে, তারপর উবে যেত ঝর ঝর অশ্রুধারায়, ভাষার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সমালোচনারূপে কাগজে প্রকাশিত হোত না।

বাংলা সমালোচনার বীজ যখন উপ্ত হোলো তখন সংস্কৃত নন্দনশাস্ত্রের রসেই সে পুষ্টিলাভ করতে লাগল। সংস্কৃত গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের বিষয় ও অঙ্গকে বিচার করা হোলো পৃথক কোরে, কতকগুলো বাঁধাধরা সূত্র দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গারদে শৃঙ্খলিত করা হোলো। বাক্যং-রসাত্মকং কাব্যম্, এবং প্রাচীনদের মতে এই রস হোচ্ছে "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ",—সেই আনন্দ-রস উপভোগের ক্ষমতা বা অধিকার সকলের নেই। সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত-এবং-আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ যেমন ম্লেচ্ছদেশ, এবং

ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি সংস্কৃত দেবতারা দেশীয় দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত যেমন সর্ব্বত্রই পরাজিত হয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃত রস-শাস্ত্রজ্ঞ ও আলঙ্কারিকেরা কাব্যরসকে ব্রহ্মানন্দ-সহোদর বোলে সে-রস উপভোগের অধিকার নিজেদের "কুলের" মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন, এবং রসের এই সংজ্ঞা পালন কোরে যে-কাব্য রসোত্তীর্ণ হোতে অপারগ হোলো তাকে ম্লেচ্ছকাব্য বোলে বাতিল কোরে দিলেন। বিদেশী বিজেতা আর্য্যদের প্রভু-মনোভাব ও স্ব-শ্রেণীপ্রীতি, দাস-প্রভুর সামাজিক পটভূমিতে কৃষি-জীবনের সুশীতল মন্থর ছায়ায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যখন দ্রাবিড়-মংগল মিশ্রিত বাংলাদেশে "আবর্ত্তে আবর্ত্তে" এসে পৌঁছল তখন সেই আবর্ত্তা-রোপিত আর্য্যত্ব মন্ত্রমুগ্ধ করল কুলশ্রেষ্ঠদের। সংস্কৃত রসজ্ঞেরা রাজসিংহাসন দখল করলেন বাংলা সাহিত্যের বিচারসভায়। বৈষ্ণব পদাবলী, বৌদ্ধগান ও দোঁহা, শূন্য পূরাণ, রামপ্রসাদী সঙ্গীত, চণ্ডীর গান, মনসামঙ্গল পাঠকের ও সমালোচকের অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ভক্তিরসের উদ্রেক কোরে ভগবদ্ভাবে মনপ্রাণ উদ্বেলিত করল। অশ্রু, গদ গদ কণ্ঠস্বর, এবং তারই যোগ্য বাহন নাদুশনুদুশ, ঢ্যাব্‌ঢেবে ও স্যাঁত্‌সেতে ভাষায় এদিকেওদিকে সমালোচনার আবির্ভাব হোতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে, ইংরেজী শিক্ষার ক্ষীণ আলোক যখন আমরা পেলাম, এবং প্রকৃত দেশের মাটি থেকে সাহিত্য সৃষ্টিও আরম্ভ হোলো, তখন সমালোচনা-সাহিত্যেরও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া গেল। ঈশ্বরগুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, কালিপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এঁরা ধীরে ধীরে নিজ নিজ প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলেন, এবং আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, তিলোত্তমা কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতির মধ্যে সমালোচকের জন্যে রসদ সঞ্চিত হোলো। কিন্তু 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর ক্যাপ্‌টেন্ রিচার্ডসন্ প্রমুখ ইংরেজী পণ্ডিতদের শিক্ষায় যে-সব বাঙালী ছাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সমালোচনার গতি-প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষায় তাকে প্রয়োগ করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, ঈশ্বরগুপ্তের "প্রভাকর" পত্রিকায় তাঁদের বিরোধিতা চলছিল। সেই সময়, প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪৪ সালে) "ক্যাল্‌কাটা রিভ্যু" পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং সেখানে ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের

সমালোচনা ইংরেজ ও বাঙালী সমালোচকেরা লিখতে আরম্ভ করেন। "সোমপ্রকাশ" ও "রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকাতেও বাংলা সমালোচনা প্রকাশিত হোত। ১৮৬৫, ১৮৬৬ ও ১৮৬৯ সালে যথাক্রমে "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিণী" প্রকাশিত হোলো এবং ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে "ক্যাল্‌কাটা রিভ্যু" পত্রিকায় বেনামা একটি বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক সমালোচনা ইংরেজীতে লিখলেন। ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হবার পর বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হোলো এবং পরে "ভারতী" ও "সাধনা" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবন্ত ও সুন্দর কোরে তুললেন। বাংলা সমালোচনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা হোলেও, রবীন্দ্রনাথই রক্তমাংস দিয়ে তার মধ্যে লালিত্য আনলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র কোরে ক্রমে একটি সমালোচকের চক্র গড়ে' উঠলো, এবং পরে "সবুজ পত্রের" মধ্যে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। তা ছাড়া মোহিতলাল মজুমদার বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সুদীর্ঘ ছায়ার চৌহদ্দি তিনিও অতিক্রম করতে পারেননি, বরং মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রসের ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দও বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা অধ্যাপকীয় ও কলেজী হয়েছে, প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা হয়নি। তার মধ্যে পাণ্ডিত্য আছে, প্রাণ নেই, দৃষ্টির পরিচয় নেই। এখানে শুধু একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হোচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশবাবু অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু মূল্যবান গুপ্তরত্ন উদ্ধার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসও বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কোরে গিয়েছেন, কিন্তু ঠিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সুবিন্যস্তভাবে সাহিত্যের বিশ্লেষণ কোরে যাননি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই গবেষণা-মূলক সঙ্কলন-কার্য্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ঠিকভাবে বিচার কোরে দেখতে গেলে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য এমন কিছু অগ্রসর হয়নি যাতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোতে পারে। প্রাচীনদের সেই বাক্যং-রসাত্মকং কাব্যং আজও বাংলার সমালোচকদের কানে ধ্বনিত হোচ্ছে, এবং কাব্যরসের আজও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ" বোলে। আজও বাংলার সমালোচকেরা নিভৃতে ব্রহ্মানন্দ-সহোদরের সঙ্গে কূজন করতে চান, আমাদের মতো সর্ব্বসাধারণের জন্যে সেই রসনীড়টির সামনে উত্তরীয় পরিয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে খড়ম হাতে দাঁড় করিয়ে রাখেন, এবং বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে আমরা, যারা সমাজ নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, বা জনসাধারণের মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে চিন্তা করি তারা কবি বা কাব্য-রসিকের কাছে ম্লেচ্ছ। সমালোচনার রাজ্যে এঁদের মনোভাব আজও আর্য্যদের মতোই রয়েছে, আর সাধারণ মানুষেরা রয়েছে অনার্য্য। তার কারণ বাংলাদেশের মাটি থেকে আজও মধ্যযুগ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, এবং সাহিত্যকে যাঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে নীরব যোগসাধনার মতো জ্ঞান করেন তাঁদের মনে এই মধ্যযুগীয় মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে আজও তার প্রমাণ স্পষ্ট রয়েছে এবং সমালোচনা-সাহিত্যে সে-প্রমাণ স্পষ্টতর।

এখন সমালোচনার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করব, কারণ তাতে বাংলা সমালোচনার বিকাশ কি ভাবে কোন্‌দিকে হয়েছে বোঝা সহজ হবে।

সমাচার দর্পণ

নূতন পুস্তক। সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্র-সিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ কেহ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকর কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচনও আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জ্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি

সুন্দররূপে তর্জ্জমা। এই পুস্তক অত্যল্পদিন প্রকাশ হইয়াছে। (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯।)

নূতন পুস্তক। শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন হালদার মহাশয় বহু-দর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তক দ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতুক ইংরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত একস্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। (২০শে আগষ্ট, ১৮২৫।)

এই পুস্তক-সমালোচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে সমালোচনা-সাহিত্য বাংলায় ভূমিষ্ঠ হোলেও তার কথা তখনো ফোটেনি। 'ক্যাল্‌কাটা রিভ্যু' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলা সমালোচনা একটা নূতন পথের সামনে এসে দাঁড়ায়, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবু অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা-সাহিত্যও নূতন জীবন লাভ করে। এই সময় শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার মনে হয় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্থান আছে এইজন্য যে এই সমালোচনার মধ্যে আধুনিক বাংলা সমালোচনার বীজ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫২ সালে কলিকাতার বীটন সোসাইটি নামে এক সাহিত্য-সভার বৈঠকে কয়েকজন প্রবন্ধকারের বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদস্বরূপ রঙ্গলালবাবু "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" রচনা কোরে পাঠ করেন। প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ আমি উদ্ধৃত করছি ঃ

......বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, প্রায় কেহই তাহাতে স্ব স্ব সাময়িক দেশের অবস্থা অথবা দেশীয় লোকের নীতি রীতি প্রভৃতি প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়া যান নাই, ইহাও এক মহাক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবেক ; কিন্তু সেই ক্ষোভ কথঞ্চিদ্রূপে কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠ করিলে নিবৃত্তি পায় ; অন্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ প্রকৃত কবির অনেক গুণে মণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্‌গ্রন্থে নানাপ্রকার অবস্থার মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব এবং ভাষা অতিকৌশলে রক্ষিত তথা পরিপাটীরূপে বিভিন্ন প্রকার রস সকল বিকশিত হইয়াছে। আমরা গৌড়ীয়া কবিতার প্রথমাবস্থার এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ সমাপন করিয়া তৎপরের অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিদ্বাহুল্য

উল্লেখ করিতেছি, অতএব শ্রোতৃবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সময়ে বর্গির হাঙ্গামা, যে সময়ে ইংরাজের বিক্রম বৃদ্ধি, এবং যে সময়ে মুসলমানের ছত্রভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক তটিনীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুন, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য ; সেই রাজার ধীরতার চিহ্নের মধ্যে এই মাত্র ছিল যে, তিনি "কাব্য শাস্ত্রবিনোদন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই প্রসিদ্ধ কথার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, অতএব স্বীয় সভাসৎ এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া কবিতা কলা কলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র রায় স্বয়ং জনেক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সেই দেশে অত্যন্ত অরাজকতা বিধায় স্বীয় সম্পদ্‌পরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এইজন্যই রায় গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্তাবকতার কারণ দেদীপ্যমানই রহিয়াছে, যেখানে লাটীন কবি অবিড্‌ মাহাত্মা স্বীয় প্রভু কর্ত্তৃক দ্বীপান্তরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র "অন্নেন পুরুষো দাসঃ" ইতি নীতিবাক্যের মর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি?......সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহৎভাব প্রকটন করণের উপযোগিতা সকল আবশ্যক রাখে, যে জাতি পরাধীনতা শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ, যে জাতি আহার বিহার ব্যতীত সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধিকরণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্মভূমিকে গরীয়সী মানিয়া কূপমণ্ডুকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহারদিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি?......

......কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা মনে করিলে নয়ন পথে অশ্রুধারার শেষ হয় না। ভারতের শব্দসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে—

(বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ—১৮৫২ সনে প্রকাশিত)

সমালোচক উক্ত সমালোচনার মধ্যে শেক্সপীয়রের 'ভেনাস্‌ এণ্ড এডোনিস্‌,' এবং বাইরনের 'ডন্‌ জুয়ান্‌' কাব্য থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত কোরে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভাষাটাকে একটু

আধুনিক রীতিতে সংশোধন কোরে নিলেই আমার মনে হয় রঙ্গলালবাবুর সমালোচনাকে যেকোনো আধুনিক বাংলা সমালোচনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।*

এর পরে ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হোলে "সংবাদ প্রভাকর," "রহস্য সন্দর্ভ" ও "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় যে সমালোচনা বেরোয় তার থেকে বাংলা সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। সমালোচনা ক'টি আমি উদ্ধৃত করছি:

সংবাদ প্রভাকর (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫)।

দুর্গেশনন্দিনী

এখানি ইতিহাসমূলক উপাখ্যান।…এক এক পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ করিতে করিতে ক্রমে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমাপ্ত করিয়াছি। পাঠকালে অন্তঃকরণে কিরূপ অপরিসীম আনন্দের উদয় হইয়াছিল, পাঠকগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া না দেখিলে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না।…

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই; দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার যদিও স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজীভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।

পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তম উত্তম উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরব স্থানীয় করিলাম।…যখন একটি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার গর্ভজাত সন্তানোৎপত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে; সে সন্তান কোথায়? পাঠকগণ স্মরণ করিয়া বলুন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কখানি মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? বাস্তবিক বঙ্কিমবাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানকার (first novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগের

* শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সঙ্গে ১৮৫২ সনের জানুয়ারী সংখ্যার 'Calcutta Review'-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্তের "Bengali Poetry" নামক প্রবন্ধ পঠিতব্য। এই দু'টি প্রবন্ধ থেকে তৎকালীন বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হবে।

দেশে যে সকল উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই প্রায় অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনী সর্ব্বাংশে সেই বিতৃষ্ণাকর দোষে পরিবর্জ্জিতা। বিশেষতঃ ইতিবৃত্তের সহিত ইহার সংস্রব থাকাতে আরো একটি মনোহর শোভা হইয়াছে।

রহস্য-সন্দর্ভ (২য় পর্ব্ব, ২১শ খণ্ড)।

বঙ্গদেশে কল্পনাশক্তির তিরোভাব হইয়াছে বোধ হয়, যে কোন গ্রন্থ নূতন হইতেছে তৎসমুদায়ই এক আদর্শের অনুকরণ সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালীতে যত গল্পকাব্য হইয়াছে তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়া স্বরূপ বোধ হয়;······এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িকপত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গল্পকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগ বিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয়না। যাঁহারা ইংরাজী গল্পকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেকস্থানে ইংরাজী নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় না। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুযায়ী, যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী, যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন, যাঁহারা মহদ্গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন, কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য গল্পটি সমস্ত অলীক নহে। ইহার মূল আখ্যায়িকাটি জাহাঁনাবাদে অদ্যাপি ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহারই সম্প্রসারণ করিয়া গ্রন্থকার আপন গল্পটি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই গল্পের বিন্যাসে অনেক প্রকার অকস্মাৎ ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের মনকে একান্ত বশীভূত করে। এবং গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত গ্রন্থত্যাগের মানসকে একালে দূরীভূত করে। গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণন দ্বারা চিত্ত বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যেকোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়।···

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ যত্নশীল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্রমহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক্ চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক

কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে।···

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের প্রশংসানামন্তর ইহা বক্তব্য হইয়াছে। যে গ্রন্থকার ইংরাজী গদ্যকাব্যের ভাবে আর্দ্র থাকায় কোন কোন স্থলে হিন্দু ও মোসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী বা বিলাতী আচার ব্যবহারের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাব বর্ণনার ব্যাঘাত হইয়াছে।···গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণ বিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিত্বে আক্রিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার "লম্ফত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন ,ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ "প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি "ত্যাগ" করেনা, কেবল পল্লীগ্রামবাসিরা "লাফছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক ·তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধুবাদ করিলাম।

সোমপ্রকাশ (২৪ এপ্রিল, ১৮৬৫)।

দুর্গেশনন্দিনী।···পাঠকগণ গ্রন্থের নামটি দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্মিয়াছিল। নামটি শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে।···

যাঁহারা আরবোপন্যাস পড়িয়াছেন, আসিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্যাস রচনা শক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকর সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনারীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন। মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা ঔৎসুক্য সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

পাঠকালে অনেকস্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপ বর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। যে স্থলে যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর সদ্ভাব অথবা যেরূপ বর্ণনা আবশ্যক, গ্রন্থকার তত্তৎ স্থানে যথোচিত রূপে সে সকলের সন্নিবেশাদি করিয়াছেন।

শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম। এ দেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণনা করিবার যে একটি রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্ব্বজন হৃদয় গ্রাহিনী হয় নাই।...

'সংবাদ প্রভাকর,' 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে'র সমালোচনা পড়ে' বোঝা যায় যে 'ভালো-লাগা-মন্দ-লাগার' স্তর অতিক্রম কোরে বাংলা সমালোচনা তখনো অগ্রসর হোতে পারেনি। সমালোচনার ঠিক রূপটি দেবার চেষ্টা করেন বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে "ক্যাল্‌কাটা রিভ্যু" পত্রিকায় "Bengali Literature" নামক একটি প্রবন্ধের মধ্যে। এই প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ আমি বাংলায় অনুবাদ কোরে উদ্ধৃত করছি :

.........প্রাচীন বাংলা সাহিত্যিকদের রচনা-তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে কোনো বাংলা প্রাচীন পুস্তকের বয়স তিনশ' বছরের বেশী নয় ...প্রথমে গীতিকবিদের নাম করা উচিত। গীতিকবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা বৈষ্ণব ছিলেন এবং এঁদের সঙ্গীতও কৃষ্ণপ্রেম ও চৈতন্যদেবের লীলা নিয়ে রচিত।···পৌরাণিক স্কুলের কবিদের মধ্যে কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের নাম করা যেতে পারে, এবং এঁরা যদিও বিখ্যাত ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, তাহোলেও অনেক ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের পরিচয় তাঁদের আছে।...মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বা কবিকঙ্কন এই স্কুলেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের চাইতে কবি হিসাবে তাঁর স্থান আরও উঁচুতে।... এই কবিদের ভাষার মধ্যে হিন্দীর কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কাব্যশক্তির দিক দিয়ে বৈষ্ণব কবিদের তুলনায় পৌরাণিক কবিরা নিম্নস্তরের।

তৃতীয় লেখকের দল নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়ের নাম পরিচিত। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' লিখে খ্যাত হয়েছেন। কোনো কাব্যগ্রন্থই কাব্যগুণের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, একমাত্র হীরার চরিত্র ভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্রের শক্তির পরিচয় কোথাও নেই। তবে কাব্যের অন্যান্য মহৎ গুণ বা বৈশিষ্ট্য ভারতচন্দ্রের মধ্যে নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না এবং তিনি বিশুদ্ধ কাব্যসৃষ্টিতে অনেক নিম্নস্তরের কবি।

বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা নদীয়ার কবিদের পরেতেই আসে। ভারতচন্দ্রকে তবু পড়া যায়, কিন্তু এ-যুগে পড়বার মতো কিছুই নেই। 'নব বাবু বিলাস' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' যুগ সাহিত্যের আবিলতার দিক দিয়ে অতুলনীয়

বলা চলে। এ-যুগের 'কবি'-গান বাংলাদেশের ধনিক হিন্দুরা অজস্র অর্থ ব্যয় কোরে গাওয়াতেন। 'কবি'-গান একটি গান নয়, অনেকগুলি গান একসঙ্গে গ্রথিত, দু'দলে মিলে গায়। পরস্পর পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দেওয়া ছাড়া এগানের উৎকর্ষের দিকে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে আর একজন লেখকের নাম উল্লেখ করা উচিত, যিনি একাই একটি শ্রেণী বিশেষ। এই লেখকের নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অতীত ও বর্ত্তমানের সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব, এবং তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিক অবনতির যুগের প্রতীক। হাল্‌কা বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন, এবং কবি ও সম্পাদক হিসাবে তিনি সাফল্য অর্জ্জনও করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ কবির কোনো গুণ তাঁর মধ্যে ছিল না, এবং তাঁর রচনা কর্কশ ও অশিক্ষিত। অনুপ্রাসের জন্যেই তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। তার গদ্যে এসব ত্রুটি না থাকলেও, সেখানে শুধু ধর্ম্ম ও নীতিকথাই তিনি প্রচার করেছেন।

আধুনিক বাংলা লেখকদের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এঁদের মধ্যে দু'টি স্কুল আছে, একটি সংস্কৃত-পন্থী, আর একটি ইংরেজী-পন্থী। প্রথম স্কুল সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের গৌরব করেন, দ্বিতীয় স্কুল পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত। সংখ্যায় সংস্কৃত-পন্থী লেখক বেশী হোলেও, শক্তিমান লেখকরা দ্বিতীয় স্কুলের অন্তর্ভুক্ত।

······সংস্কৃত-পন্থী লেখকরা সংস্কৃত লেখকদের আদর্শ অনুসরণ করেন, এবং সেইজন্য তাঁদের মধ্যে মৌলিকত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক রচনা এঁদের কিছুই নেই। মৌলিকত্বের চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ব্বানুসৃত পথ ছেড়ে চলবার এঁদের ক্ষমতা হয়নি।······যেমন 'প্রেম' বিষয় হোলে এঁরা সঙ্গে সঙ্গে মদনকে তলপ্‌ করেন, এবং মদন পঞ্চ পুষ্পশর নিয়ে উপস্থিত হন, সঙ্গে থাকেন রাজা বসন্ত, আর মলয় ভ্রমর প্রভৃতি সেনাবাহিনী।······এঁদের রচনার মধ্যে এমন একটিও সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে না যে 'চন্দ্রবদনা' ও 'পদ্মলোচনা' নয়, যার কেশদাম মেঘ স্তবকের মতো নয়, এবং নাসিকা যার গরুড়ের চঞ্চুর মতো তীক্ষ্ণ নয়। ······টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথম এই ভণ্ড পাণ্ডিত্যের লৌহ প্রাচীরে আঘাত কোরে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তিনি সংস্কৃত ছাত্রদের ধ্যান ধারণা ধূলিসাৎ কোরে দিয়ে প্রকৃতি ও জীবন থেকে তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনার উপকরণ সংগ্রহ করলেন। টেকচাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলেন ঔপন্যাসিক কালিপ্রসন্ন সিংহ, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকলের অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতিও যুক্তিহীন। অন্য ভাষা থেকে সুন্দর অনুবাদ করতে পারলেই যদি রচয়িতা হবার অধিকার জন্মায় তাহোলে

অবশুই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখক বোলে স্বীকার করতে হয়। যদি প্রাথমিক শিক্ষার গ্রন্থ প্রণয়নে সে-অধিকার আরও বেশী শক্তিশালী হয় তাহোলে বিদ্যাসাগর শক্তিশালী লেখক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা জানি যে অনুবাদ করলে বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাইমার রচনা করলে তাতে প্রতিভার পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং বিদ্যাসাগর তার বেশী কিছু করেননি।······

······টেকচাঁদ থেকে হুতোম খুব সহজ পরিবর্ত্তন। টেকচাঁদের রচনারীতি কালীপ্রসন্ন সিংহ গ্রহণ কোরে তাকে আরও সহজ ও সুন্দর করেছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' মধ্যে সহুরে জীবনের নক্সা আছে, ডিকেন্স্‌-এর Sketches by Boz-এর মতো, এবং সহরের সমস্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাত্রার প্রণালী অদ্ভুতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে 'চড়কপূজা', 'বারোয়ারী', 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত' ও 'স্নানযাত্রা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

······মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্ষমতাশালী নাট্যকার ও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে 'মেঘনাদ বধ', 'তিলোত্তমা' 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' সর্ব্বজন-পরিচিত, এবং প্রমম দু'টি মহাকাব্য বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত।······ 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিষয়টি যদিও রামায়ণ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তাহোলেও সম্পূর্ণ কাব্য তিনি নিজের প্রতিভা বলেই সৃষ্টি করেছেন। বহু চিত্র, চরিত্র ও কাহিনী মধুসূদনের নিজের সৃষ্টি। মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে তাঁর শিল্পীমনের এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। হোমার, মিল্টন ও বাল্মিকীর কাছে যদিও তিনি অনেক দিক থেকে ঋণী, তাহোলেও তিনি সবকিছু উপলব্ধি কোরে একান্ত নিজের কোরে নিয়েছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-শক্তি অতুলনীয়।······

মধুসূদনের ত্রুটি যে নেই তা নয়। যখন মৃদু সমীরণেরও প্রয়োজন নেই তখন দেখা যায় পবন দৈত্যের মতো তাঁর কাব্যের মধ্যে গর্জ্জন করছে। অনর্থক মেঘ জমা হয়ে ভীষণ বৃষ্টিপাত হোচ্ছে অথচ বৃষ্টি না হোলেও চলে। সাগর তখন ক্রোধে আস্ফালন করছে যখন পাঠকের সে-আস্ফালন সহ্য করবার মতো মনোভাব নেই। এই সব অতিরঞ্জনের গুরুতর দোষ মধুসূদনের মধ্যে আছে, এবং একই চিত্র বা শব্দ প্রয়োগ কোরে তিনি পাঠককে বিরক্তও করেন।

নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন তেমন সার্থক হোতে পারেননি।······বাংলার নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু পাঁচখানি নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে দু'টি কৌতুকপূর্ণ। তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকের খ্যাতি য়ুরোপীয়দের মধ্যে বেশী।······নীলকরদের দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ

থাকার দরুণ সাধারণের মধ্যে নাটকখানি তথাকথিত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মিঃ লঙ-এর শাস্তির পর সাধারণের ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা যখন বৃদ্ধি পেল তখন "নীলদর্পণ"-কে সকলে জঘন্য ও অপাংক্তেয় নাটক বোলে নিন্দা করতে লাগল। অবশ্য এ-মতের সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু আর্টের দিক দিয়ে নীলদর্পনের স্থান যে অনেক নীচুতে তা স্বীকার করতেই হবে। নীলদর্পনের খ্যাতি রাজনৈতিক কারণে, সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্যে নয়, সেইজন্য 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে এখানে আর বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ...

(Calcutta Review ; 1871—No. 104, P. 294-P. 316)

এই সমালোচনা পড়লেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে 'রস' বা "বিশুদ্ধ" সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হোলেও, বঙ্কিমবাবু সেই দৃষ্টিতেই বাংলা সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। সমালোচনার মধ্যে নীতিবাগীশদের সুনীতি-জ্ঞানও তাঁর সাহিত্যবিচারের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া উক্ত সমালোচনা থেকে আর একটি মতও তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার তিনি বিরোধী, এবং বিষয় হিসাবে সাহিত্যে সমাজ বা রাজনীতি কতকটা তাঁর কাছে অস্পৃশ্যই। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" নাটক সম্বন্ধে অবজ্ঞার সহিত তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর সমাজ-বিচ্ছিন্ন 'শিল্পীর' মনোভাব। দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা "নীলদর্পণ'', এবং এই নাটকের মধ্যে দীনবন্ধু বাংলার চাষাচাষীদের চরিত্র যেরকম সুনিপুণভাবে এঁকেছেন, গ্রাম্য-ভাষায় এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে তাদের যেভাবে মুখর ও জীবন্ত করেছেন, তাতে আজ হয়তো আমরা না স্বীকার করলেও, আজ থেকে বিশ কি ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ 'তোরাপ' ও 'ক্ষেত্রমণি' তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক শিল্পীর সুযোগ্য সম্মানে বিভূষিত করবে। দীনবন্ধু কোনো রাজনৈতিক মতবাদকে প্রচার করেননি, সে-যুগে সেরকম কোনো মতবাদ তাঁর প্রচার করবার ছিলও না, তিনি প্রত্যক্ষ সামাজিক সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি কোরে, তাকে নিজের গভীর অনুভূতির রঙে রঞ্জিত কোরে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, এবং তা সাহিত্যও হয়েছে। অনুভূতির গভীরতা ছিল বোলেই সাহেবের বেত্রাঘাতে ক্ষেত্রমণির চীৎকার ও প্রতিবাদ আজও আমাদের

কানে ভেসে আসে : "মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল্, মুই কিছু বল্‌বো না; মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার স্বগ্‌গে চলে যাই,—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ীর ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মড়া মরে না? মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো।" এই দৃঢ়তা ও কুসংস্কার-মিশ্রিত কৃষককন্যার চরিত্রের কাহিনী আজ প্রতিদিন বাংলার প্রত্যেক জেলা ও গ্রামে গ্রামে আমরা শুনতে পাই। কারণ এদেশের জীবনের স্পন্দন ঐখানে এবং সে-স্পন্দন দীনবন্ধু শুনেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন।

সমালোচনার এই আদর্শকেই বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-৭৬) পত্রিকায় রূপ দেন। সাহিত্য-সমালোচনাতে ঠিকভাবে মনোযোগ দিতে না পারলেও, এবং ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের পুঁথির দিকে আকৃষ্ট হোলেও, সমালোচনার একটা ক্ষীণস্রোত তাঁরই প্রচেষ্টায় সে-সময় প্রবাহিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'রস' ছিল, 'সৌন্দর্য্য' ছিল, 'নীতিজ্ঞান' ছিল, 'শাস্ত্র' ছিল, এবং তার সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যানুরাগ।

তারপর রবীন্দ্রনাথের যুগ। 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা সমালোচনাকে নূতন বেশভূষায় সুসজ্জিত কোরে পুরাতন রসশাস্ত্রের রাজসিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে পুরাতন যেন আবার নূতন হয়ে উঠলো। সাহিত্যকে সমাজের বা জীবনের প্রাত্যহিক কোলাহল থেকে বহুদূরে এক বৈরাগী, নীরব সাধকের তপোবনে তিনি স্থানান্তরিত করলেন, এবং যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে এই ব্রহ্মানন্দলাভের কাহিনী আমরা শুনে এসেছি, তবু আবার নূতন কোরে যাদুকরী কথার মোহে বিস্মৃত হয়ে পুরাতনের দিকেই হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জয় হোলো, এবং বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ কোরে নিজের সম্ভার-বৃদ্ধি কোরে ঐশ্বর্য্যবান হোলো। এমনকি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যেখানে 'রস, ভাব, অনুভাব,' 'স্থায়ী, অস্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় কাব্য বা সাহিত্যকে বিরস কোরে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনাকে অপসারিত

কোরে সেখান থেকে শুধু তার মণিখচিত অংশটুকু নিয়ে তাকে পুনরায় দীপ্যমান করলেন। আমরা তাই তাঁর শব্দমাধুর্য্য ও প্রকাশ-মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। অবশ্য পরিবেষ্টন মধ্যে মধ্যে তাঁর অন্তরাত্মার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, বহুদূরের নির্জ্জন দ্বীপ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে মাটির বুকে। কিন্তু তাও ক্ষণিকের জন্যে, সে-ক্ষণ অবজ্ঞা-মিশ্রিত, এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে সে-দৃষ্টি আকাশ থেকে মাটির দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "লোকসাহিত্য" পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাংলা 'কবি'-সঙ্গীতকে সরাসরি 'literary filth' বোলে বাতিল কোরে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেই জন্য রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, তা'র ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল—তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।

কিন্তু ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।··· তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্‌সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু স্বরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।

(লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবিগান বৈষ্ণব কাব্যের মতো গভীর নয়, অধ্যাত্মিকতায় ভরপূর নয়, শ্লীল নয়, ভাষার বা ছন্দের কারুকাজ নেই তার মধ্যে—কেবল সুলভ

অনুপ্রাস, ঝুঁটা অলংকারই তার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই সব দোষের বিচার করেছেন, কিন্তু যথার্থই রাজসভার কবিরা প্রচুর অবসরের মধ্যে তাঁদের যে-কাব্যকে ভাষা ও ছন্দের জড়োয়া গহনায় সাজিয়ে জনসাধারণের মাঝখান থেকে দূরে রাজার গুণীজনের সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজ বিজয়ের প্রাথমিক যুগে এ-দেশের কবি-গায়কেরা সেই একই বিষয় ও ভাবকে জনগণের কাছে প্রকাশ করবার জন্যে নিরাভরণ করেছিলেন। প্রকৃত গণসাহিত্য সৃষ্টির সেই ক্ষীণ ও অমার্জ্জিত প্রচেষ্টা বিদেশী শাসনদণ্ড ও দেশী আত্মাভিমানের আঘাতে আজ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু লুপ্ত কখনো তা হবে না, কারণ যার মধ্যে সহজ ও সুন্দরের সাবলীল প্রাণের স্ফূর্ত্তি ছিল, আজ পারিপার্শ্বিকের চাপে তার শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হোলেও, অদূর ভবিষ্যতে একদিন সেই প্রাণের সারল্য তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবে। একথা "গ্রাম্যসাহিত্য" সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন ঃ

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক আর না থাক সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে-জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে-কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।... কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে—কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে—পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

(লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'সর্ব্বসাধারণ নামক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তির' মনোরঞ্জনের জন্যে যে-কাব্য বা সঙ্গীত কবির অন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হোত, তাকে প্রকৃত কাব্য বা সাহিত্যের 'রাজসভা' থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং 'নিম্ন সাহিত্য' বোলে তাকে সার্ব্বভৌমিকের সম্মান দিতে সম্মত হননি। আমরা জানি না 'সার্ব্বভৌমিক' কি, তবে এইটুকু জানি যে 'সার্ব্বভৌমিক' যদি আন্তর্জ্জাতিক কোনো কল্পনাবিলাসী বা সৌখীন শ্রেণী-সাহিত্য হয়, তাহোলে গ্রাম্য সাহিত্য সে-বিশেষণ বর্জ্জনই করবে। কিন্তু মাটি ও মানুষ থেকেই তার জন্ম বোলে, জীবনের স্বচ্ছ

তরল রসে সে পরিপুষ্ট বোলেই, নৃত্যে, গীতে, ছড়ায়, কথায় সে একদিন বিশ্বমানবের অন্তরের সুরের সঙ্গে সুর মিশিয়েছিল, দেশীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। দেশের মধ্যেই সে ছিল বিশ্বের রত্ন, এবং বিশ্বের বা পৃথিবীর বোলেই সে ছিল একান্ত দেশের, জনগণের একান্ত আপনার।

গ্রাম্য সাহিত্য বা 'নিম্ন সাহিত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই করুণা-মিশ্রিত প্রশস্তির মধ্যে সাহিত্যের তাৎপর্য্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পরে তাকে তিনি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাতে পুরাতন ঋষি ও আলংকারিকেরা যেমন স্তব্ধ হয়েছেন, আমরাও তেমনি বিমুগ্ধ হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন ঃ

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দ গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানস সঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্যে তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

(সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সাহিত্যের তাৎপর্য্য" নামক প্রবন্ধ)

সাহিত্যকে যে আলংকারিকেরা "পরমব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ," পরম ব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ, বা "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ", ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তাদের শিষ্যবর্গের পক্ষে স্তব্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এবং 'দশরূপের' ভাষায় আমাদের মতো "অল্পবুদ্ধি সাধুলোকদের" হতভম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। "পরমব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" থেকে "সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী"—একেবারেই দূর যাত্রা নয়, যাত্রা ও ফল উভয়ই অভিন্ন। এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্শনিক হেগেলের শিল্প-দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। দার্শনিক

হেগেল বলেছেন যে শিল্প হোচ্ছে 'Absolute' বা পরমব্রহ্মের ক্রমিক অভিব্যক্তি—এবং ভাব ও বস্তুর মধ্যে বস্তুর আধিপত্য থেকে, ভাব ও বস্তুর সম্যাবস্থার ভিতর দিয়ে, বস্তুকে অতিক্রম কোরে ভাবের ঊর্দ্ধযাত্রা হয়। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা শিল্পকে হেগেল বলেছেন* Oriental, দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলেছেন Classical এবং তৃতীয় শ্রেণীকে Romantic বলেছেন। রোমান্টিক শিল্পে ভাবের চরম বিকাশ হয়, তারপর আর কিছু নেই, কারণ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"—পরম পুরুষের সাক্ষাৎকারের পর সীমার শেষ, গতির নিবৃত্তি। এই বস্তুর প্রাধান্যের জন্যেই গ্রাম্যসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য বলেননি, কারণ জনপদের স্থূল চিহ্ন সেখানে রয়েছে, ভাবের রেশমী বুনুনি নেই, এবং সাহিত্যকে রচয়িতার বা ব্যক্তিবিশেষের না বোলে তিনি বলেছেন 'দৈববাণী'। এই দৈববাণীর প্রকাশকে বিশ্লেষণ কোরে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশে ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেইপ্রকার। যদি দু'য়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

...সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"

(সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যের বিচারক' নামক প্রবন্ধ)

জগতের উপর মনের কারখানা এবং তার উপর যে বিশ্বমনের কারখানা, আধুনিক বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট্‌-এর সাহায্যে সেখানে আরোহণ

* হেগেল, বেনেডেটো ক্রোচে ও কার্ল মার্কস্‌-এর শিল্প-দর্শন (Philosophy of Art) সম্বন্ধে তুলনামূলক ব্যাখ্যা আমার "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" নামক পুস্তকের "প্রথম খণ্ডের" দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি।

করতে আমরা পারব না। সুতরাং এইটুকু বুঝে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল যে এই 'বিশ্বমন' ও 'বিশ্বমানবিকতা', উপনিষদের 'ঈশ' এবং তাঁর উপলব্ধি ভিন্ন কিছু নয়। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তি ও যুক্তিতে স্পষ্ট রয়েছে।

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি রূপকে আশ্রয় কোরে মানবাত্মারও তিনটি রূপ আছে। তার একটি হোলো 'আমি আছি', একটি 'আমি জানি,' আর একটি 'আমি ব্যক্ত করি'। এই রূপকে রবীন্দ্রনাথ 'তাজমহল' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন:

এই যে তাজমহল—এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহ-বেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে কোঠাতেই রাখুন, তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন পর নেই, সে অনন্তের বেদী। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে, তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক্ তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্ব্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্চে ওঁ—অর্থাৎ হাঁ। তাজমহল হচ্চে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ—নিখিলের সেই গ্রহণমন্ত্র মূর্ত্তিমান।

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ)

'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলেছেন:

অসীম একের সেই আকুতি, যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হোলোনা, সেই সৃষ্টির আকুতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকুতিই তো সেই বেদনা, যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত ক'রে রয়েছে। সে "রোদসী" "ক্রন্দসী"—সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়,

আকাশে আকাশে নানা আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত—সূর্য্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে রস মানুষের কাছে এসে পৌছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে জল তার জন্যে ভাঁড় হোক, গণ্ডুষ হোক কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কি?

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ যে-শিল্পে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা সঞ্চিত হবে এবং অব্যক্তের গভীরতায় যে-শিল্প অনির্ব্বচনীয়, তাকে শরীরী তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে 'ভাবের' আভরণ খসিয়ে মাটির বুকে নামিয়ে আনবার প্রয়োজন কি? আমরা হয়তো বলতে পারি যে রূপদক্ষ তাঁর চিত্তকে এই যে একটি অমর্ত্ত্যলোকের ঘটের উপর দেউলে হয়ে উজাড় কোরে দিলেন, এর সমস্তই তো বাজে খরচ হোলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন: "সে কথা মানি; সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গী। যারা মুনফার হিসাব রাখে, তারা বলে এটা লোকসান; যারা সন্ন্যাসী, তারা বলে এটা অসংযম। বিশ্বকর্ম্মা তাঁর হাপর-হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না; বিশ্বকবি এই বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্চেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হোলোনা।" তবু আমরা বলব এই রঙবেরঙের ঝুঁটিওয়ালা কচি কচি মিষ্টি বুলবুলির ভাষার খোলসটি খসিয়ে ফেললে ভিতরে 'ঈশোপনিষদ্'-ই বেরিয়ে পড়ে।

...উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি ব'লেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি ব'লেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধ)

এই কথা বোলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ-সংশয়-ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে শৃঙ্খলিত কোরে রাখে বৈষয়িক কারাগারে, এবং ফলে মানুষ হয় 'কাঁচি-ছাটা' মানুষ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বললেনঃ "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক।" আমরা অবাক্ হোলাম না, কারণ সাহিত্য "দৈববাণী" থেকে বিশুদ্ধ সাহিত্য "অপ্রয়োজনীয়" পর্য্যন্ত পৌঁছতে মাঝখানে যে দু'একটা ধাপ পার হোতে হয় তা আমাদের জানা আছে। বরং একই স্থানে ওদের বসবাস বললে অন্যায় হয় না। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ সমস্ত রকমের আধুনিকতার যেমন বিরোধী, তেমনি সাহিত্যে বাস্তবতার কথা উঠলে তিনি নিজের ভঙ্গীতে বিদ্রূপ কোরে বলেনঃ "রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোক-হিতৈষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছেড়ে নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রস-ভারতী স্বয়ম্বর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করে থাকেন"। সাহিত্যিক-'দময়ন্তী'রা নলকে অনুসন্ধান করুন, আমরা 'অরসিকের' দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি।

সাহিত্যের এই 'উপনিষদীয়' ব্যাখ্যাতে অনেকে আশ্চর্য্য হবেন, হয়তো ভাববেন, যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি, যাঁর দৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা অতলস্পর্শ, যাঁর রূপদক্ষতা অতুলনীয়, তিনি এমনভাবে সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে কেমনভাবে অনাবিল 'সৌন্দর্য্য' ও ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হোলে, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করেঃ "...বিশ্বকবি বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্চেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হোলো না"। রসের ব্যাপার হয়তো দেউলে হবে না, আজ তো হবেই না, কারণ এ-দেশের মধ্যযুগীয় মাটিতে তার পরিপুষ্টির খোরাক্ এখনো প্রভূত রয়েছে। তবু একবার কৈফিয়ৎ দাবী করতে ইচ্ছা হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে, মনে হয় বলি এই শান্ত, সমাহিত,

ধ্যাননিমীলিত যোগীর দৃষ্টির কারণ কি? আমাদের মতো সমাজ-সচেতন যাঁরা, তাঁদের আপাতত সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

...**আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি।** আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদি কালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ দূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনো দিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়-সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠেছে—বলে উঠেছে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে, যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই **প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।**

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন; লোভ ক'রো না। **কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।** ...অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। **তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই।** এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, **আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন।**

(রবীন্দ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড—অবতরণিকা)

এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশোপনিষদের জয় হয়েছে, মানুষের বা মর-জগতের জয় হয়নি বোলেই তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' আহ্বান দিক্‌ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরানি বোলে মনে হয়, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়বার পরে রুষ-ফিনিশ যুদ্ধে সোভিয়েটের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ, এবং পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের কাছে শান্তির জন্যে আবেদন পড়ে' মনে হয় 'বিচিত্র', আর তাঁর সাহিত্য-সমালোচনাতে প্রাচীন সংস্কৃত রসশাস্ত্রজ্ঞদের উক্তির ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি দেখেও ভাষা ও প্রকাশের ঐন্দ্রজালিক শক্তির দিকে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। আর বাদ্‌শাহ-রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জ্জন, নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে' তিনি যখন ধনতান্ত্রিক সমাজের রূপ নিরীক্ষণ করেন, তাঁর 'উপন্যাসে' বা 'সাহিত্য-সমালোচনায়', তখন তার কদর্য্য আবর্জ্জনার দিকটাই তাঁর চোখে পড়ে, অগ্রগামী বৈপ্লবিক শক্তিগুলি নির্ব্বিবাদে অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কারণ অবশ্য সেই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, এবং তার সঙ্গে হঠাৎ-প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক আবেষ্টন,—এই দু'য়ের সংমিশ্রিত পরিবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন :

উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। **অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।** এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন এক দিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পিয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক

গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।

এই সকল আকাঙ্খা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল।…

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেঁইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড—অবতরণিকা)

এইবার নিশ্চয়ই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেন উপনিষদের জয় হয়েছে, কেন তিনি বর্ত্তমান অরাজকতায় অস্থির হয়ে সামন্ততন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে, প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের মন্ত্র, ত্যাগ ও মুক্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন, কেন তিনি বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েও সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজামহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠীর, পরোক্ষে ও অজ্ঞানে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এবং কেন তাঁর বিমূর্ত্ত, কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মানব-প্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণী-প্রীতির মহাকীর্ত্তন করেছে। বিংশ শতাব্দীতেও যে-প্রতিভা মানুষকে এমন কৌশলে, এমনভাবে প্রলুব্ধ কোরে প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেতপুরীতে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে, সে-প্রতিভা সহস্রবার নমস্য, যুগের বিচার যাই হোক্ না কেন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে উপনিষদ্‌-এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কোরে রবীন্দ্রনাথ এমন স্বরে তার জয়বার্তা ঘোষণা করলেন, 'কাদম্বরী' থেকে আরম্ভ কোরে 'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' পার হয়ে 'আধুনিক কাব্য' আলো-চনার আসরে পর্য্যন্ত সেই উপনিষদ, সেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের তিনি এমন

ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কোরে গেলেন, যে তাঁর পরবর্ত্তী সমালোচকেরাও তার জৌলুষে, তার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ধাঁধিয়ে রইলেন, যাদুমুগ্ধ হয়ে, একপাও অগ্রসর হবার ক্ষমতা তাঁদের রইল না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁদের আবির্ভাব আলোকদান তো করলই না, উপরন্তু তাঁরা সমভাব বহনের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের শক্তির স্বল্পতার জন্যে হাস্যকর হোলেন। তবু তাঁদের আমরা অভ্যর্থনা করব, কারণ তাঁদের আবির্ভাব অহৈতুক নয়, অবশ্যম্ভাবী। রাবিন্দ্রিক প্রতিভার বিশাল শীতল ছায়ায় একে একে সমালোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার। আর অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের কাছে নীরব অর্ঘ্যদানের সমালোচনায় দীক্ষিত হয়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় স্তব করলেন সৌন্দর্য্যবাদের, এবং দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'রবি-দীপিতায়' শুকনো কাঠের মতো ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন উপনিষদ্ কি এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র কতো সমৃদ্ধ। অতুলবাবু অবশ্য স্বীকার করলেন যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এমন অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন যাতে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই, কারণ, তিনি বললেন, কালভেদে কেবল মীমাংসার পরিবর্ত্তন ঘটে না, প্রশ্নেরও বদল হয়। অতি সুন্দর কথা। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কাব্য-বস্তু এক মেনে নিয়ে, আলংকারিকদের বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্তঃদৃষ্টির গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর "কাব্য-জিজ্ঞাসা" পুস্তকের মধ্যে তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন। একে আমরা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভাণ্ডার-বৃদ্ধি বলতে পারি, কারণ ভবিষ্যতে আমরাই হয়তো দশরূপ, অভিনব গুপ্ত, বামন প্রভৃতি আলংকারিকদের মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করব, কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন অবদান বোলে একে নিশ্চয়ই স্বীকার করব না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সীমানা অতিক্রম কোরে অতুলবাবু যেতে পারেননি, যদিও সে-দিকে প্রয়াসের চিহ্ন তাঁর 'কাব্য-জিজ্ঞাসার' শেষ অধ্যায়ে কিছু কিছু আছে। তিনি আলংকারিকদের অস্তিত্বহীন অমৃতরসের আস্বাদে বিভোর হয়ে তাঁদেরই গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন। তিনি বলেছেন:

আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ

বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ' দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিমে ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত করে' মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে—তাতেই এ মনোভাবের জন্ম। এর আশ্চর্য্য সফলতায় সমাজ ও জীবনযাত্রার কাম্য থেকে কাম্যতর পরিবর্ত্তনের এক **অবাধ ও সীমাহীন আদর্শের** ছবি মানুষের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। লোকের ভরসা হয়েছে এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজব্যবস্থা একদিন, এবং সেদিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী করে' দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্ মন্ ধন'-এর উপর এঁদের দাবীও তত বেড়েছে।......

প্রাচীন আলংকারিকদের সাম্‌নে **আশার এই মরীচিকা** ছিল না। তখনকার জ্ঞানীলোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন। একে মন্থন করে' যে দু-এক পাত্র অমৃত উঠেছে, তার অমৃতত্ব যে আবার ঐ সংসারের মঙ্গল সাধনে—এ কথা তাঁরা মান্‌তে চান্ নি। কাব্যের রসকে তাঁরা সংসার বিষ-বৃক্ষের অমৃত ফল বলেই জানতেন। **আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও এ কথা কি করে' অস্বীকার করা যায় যে গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়।** কাব্য যে মানুষের সভ্যতা-বৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও-গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে। এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। **কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘট্‌লে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা তা দিয়ে তার দাম যাচাই-এর কথা কেউ মনে ভাবে না।** সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টি-সাধন করে যা মুকুলে ঝরে' যায়।

(কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত—'ফল' শীর্ষক অধ্যায়)

অতুলবাবুর এই অভিমতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই:

আমাদের শাস্ত্র বলেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।" বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মণীষা মনসা তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়?

মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেন-না বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ। এই অধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে।······

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কাব্য বা সাহিত্যকে সংসার বিষবৃক্ষের অমৃতফল বোলে তারই রসাস্বাদনের লোভে অতুলবাবু তাকে সংসার বা সমাজের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করতে রাজী নন, কারণ ফল দিয়ে মূলের পরিপুষ্টি সম্ভব নয়, এবং সেই ফলই গাছের পুষ্টিসাধন করে যা মুকুলে ঝরে' যায়। রবীন্দ্রনাথ যা শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, অতুলবাবু আলংকারিকদের মত উদ্ধৃত কোরে তাই প্রমাণ করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার কথা যা সেখানে আছে তা শুধু থাকার খাতিরে আছে, এবং সমাজ বা সভ্যতার মাটি থেকে রসপান কোরে যে-ফল বা ফুল গাছে ধরল, রস শুকিয়ে গেলে তার আর মাটির কথা স্মরণ করবার অধিকার রইল না, উপরের আকাশের দিকে দেবতার কাছে বারিদানের বরপ্রার্থনার দাবী জন্মাল। কাব্যকে এই ধরণের 'ফল' বলার কি যুক্তি, এবং পরে এইভাবে মাটিহারা হবারই বা কি কারণ, তা অতুলবাবু সরল কোরে প্রকাশ করলেন না, আলংকারিকদের শ্লোকে শ্লোকে ফাঁক ভরাট কোরে দিলেন।

প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদারও রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত আলংকারিক ও উপনিষদ্-নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই দৌড়ঝাঁপ করেছেন, তাকে লঙ্ঘন করতে পারেননি। মোহিতবাবু শেষ পর্য্যন্ত হয়রাণ হয়ে যাবতীয় 'প্রগতির' বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করেছেন, এবং সাহিত্যে প্রগতির বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'তে মধ্যে মধ্যে তিনি নিজের রণমূর্ত্তি প্রকাশ কোরে থাকেন, দুঃখের বিষয় অসংযত ও রুচি-বিরুদ্ধ ভাষায়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর দান অবশ্য যথেষ্ট, এবং 'দীনবন্ধু', শ্রীমধুসূদন', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার মধ্যে তিনি নিজের মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়েও যথেষ্ট শক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আর একটি দানও উল্লেখযোগ্য। তিনি য়ুরোপের ফিউড্যাল ও বুর্জ্জোয়া সমালোচকদের সঙ্গে বাংলার পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এবং নিজের মধ্যযুগীয় মনোভাব

তার সঙ্গে মিশ্রিত কোরে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের (বেশী উনবিংশ শতাব্দীর) সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রমথবাবু বা মোহিতবাবু কেউ সেই অবাস্তব 'রস', যা ব্রহ্মাস্বাদের সচিব, তার গণ্ডী পার হোতে পারেননি। প্রমথবাবু 'সবুজপত্র'-এর প্রথম সংখ্যার মুখপত্রতেই বললেন :

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বলতে পারিনে, কেন না, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার **মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই।** অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে' পাবার জিনিষ নয়। তবে বাঙলার মন যাতে আর বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন।"

(সবুজপত্র—১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

য়ুরোপের গতিশীলতায় চঞ্চল হয়ে 'সবুজ পত্র' বাংলাদেশকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল সত্য, কিন্তু প্রারম্ভেই যে ঔষধসেবনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে মর্ফিয়া-ইন্‌জেক্‌শনের কাজ হয়েছে, অর্থাৎ য়ুরোপীয় জীবনের আদর্শকে চোখের সামনে তুলে ধরেও বলা হয়েছে সামন্ততন্ত্রের দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় প্রাণভরে অকাতরে ঘুমোও। সেই ঘুমের উপর প্রশান্তির প্রলেপ টেনেছে 'শনিবারের চিঠি,' প্রাক্তনকে গৌরবান্বিত কোরে আধুনিকতার বৈরিতা করেছেন শনি-মণ্ডলী। সাহিত্য-বিচারে তাঁরা একপাও অগ্রসর হোতে পারেননি। মোহিতবাবু তাঁর "সাহিত্যের স্বরাজ" নামক প্রবন্ধের মধ্যে বলেছেন :

যে-শক্তির দ্বারা মানুষ নিজের সত্তাকে একটি আশ্চর্য্য উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের সহিত যুক্ত করিয়া সেই রহস্যকে একটি গভীর রসসত্যরূপে উপলব্ধি করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সংশয়ের সমাধান নয়—নিরাকরণ করে, তাহাই কবির দৈবীশক্তি বা প্রতিভা। যে কবির প্রতিভায় এই প্রজ্ঞানের যতটা বিকাশ হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে এই সৃষ্টিরূপী রস-স্বরূপ ব্রহ্মের দ্রষ্টা।

(সাহিত্য-কথা—মোহিতলাল মজুমদার)

এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ, সংস্কৃত আলংকারিক বা রবীন্দ্রনাথের উক্তির পার্থক্য কোথায়? তাছাড়া 'বাস্তব' সম্বন্ধে মোহিতবাবুর অদ্ভুত

ধারণার মধ্যে তাঁর এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তিনি যে যাবতীয় প্রগতি-বিরোধী তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। "সাহিত্যে সমস্যা" নামক প্রবন্ধের মধ্যে মোহিতবাবু লিখেছেন :

প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের উপর কবি-কল্পনার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, অর্থাৎ কবি-কল্পনা জগৎ ও জীবনকে গভীর ভাবে আশ্রয় করিয়া, যেমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তেমনই অবশেষে **বাস্তবেরই উপাসনায় আজিকার সাহিত্যে তাহার যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা তর্ক বিচারের বিষয় নয়**—রস পিপাসুর পিপাসানিবৃত্তির পক্ষে সাহিত্য যে জলের পরিবর্ত্তে পাকা বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রমাণ সকল সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয়ের মধ্যেই পাইতেছেন। যদি তাহা সত্য না হয়, রসের ধারণাই যদি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে কাব্য জগতে একটা মহামন্বন্তর ঘটিয়াছে ;······

(সাহিত্য-কথা—মোহিতলাল মজুমদার)

তারপরই মোহিতবাবু 'সাহিত্যের আসরে' বক্তৃতা দেন :

সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—এ কথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী যাত্রার মত যখন তখন যেখানে সেখানে আসর বসাইবার জন্ম মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না। কারণ, সাহিত্য উপভোগ করিবার মত **সংস্কার ও সংস্কৃতি** সকলের নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক বচসা যেমন সকলেই করিতে পারে, সাহিত্যকে লইয়া তাহা করিতে পারিলে সাহিত্যই উবিয়া যায়। অতএব, সাহিত্যের আসরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি বলিতে হইল বলিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত হইতে বলি যে, সাহিত্য-রসিক হইতে না পারাটা যতই লজ্জার বিষয় হউক মানুষের আত্মগৌরব বৃদ্ধি করার জন্ম আরও কত বস্তু রহিয়াছে—সেখানে সিদ্ধিলাভ যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব তাহা মাত্রাভেদে অনেকেরই আছে। সাহিত্য-রসবোধের যে সাক্ষাৎ জ্ঞাতিশত্রু, তাহার নাম পাণ্ডিত্য······

(শনিবারের চিঠি—ভাদ্র ১৩৪৭)

রবীন্দ্রনাথ নল-দময়ন্তীর কাহিনী উল্লেখ কোরে কাব্যরসিকের যে বর্ণনা করেছিলেন, মোহিতবাবু অসাহিত্যিক ভাষায় এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর ১৮১৯ সালের সমাচার দর্পণ-এর সময় থেকে ১৯৪০ সালে মোহিতলাল মজুমদার পর্য্যন্ত একশ' ত্রিশ বছরের মধ্যে আমাদের

বাংলা সমালোচনা "পুস্তক দ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক" থেকে "সাহিত্য আলোচনার জিনিস নয়—সাহিত্য রসবোধের সাক্ষাৎ জ্ঞাতিশত্রু পাণ্ডিত্য" পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য মোহিতবাবু যখন বলেন যে জাতি-গত বিশিষ্ট চেতনাই সাহিত্যের স্বধর্ম্ম ও উৎস, কারণ সেখান থেকেই সর্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব রস উৎসারিত হয়, তখন তিনি যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত তা স্বীকার করতেই হবে, এবং সেই স্বধর্ম্ম উপাসনাকেই যখন তিনি কল্যাণকর মনে করেন, তখন আমাদেরও বলতে হবে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েছেন, প্রতিক্রিয়াশীলতার ইন্ধন জুগিয়েছেন বেশী। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত-এর "আধুনিকী"-ও উল্লেখযোগ্য। নলিনীবাবু প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বিচার কোরে বলেছেন যে পুরাতন সাহিত্য মানুষের দেবত্ব-ব্যঞ্জক, আর আধুনিক সাহিত্য পাশবিকতার বীভৎস সাধনায় বদ্ধপরিকর। তিনি 'নিরিন্দ্রিয়' সঙ্গম, 'অতীন্দ্রিয়' প্রেম, 'অন্তর্জ্ঞান' প্রভৃতির যে অবতারণা করেছেন, সাহিত্যে তাদের সমর্থন করেছেন লাতিন-লেখক, কালিদাস, বৈষ্ণব কবি—এঁদের দৃষ্টান্ত দিয়ে। এইরকম অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে অভিনব ও চমকপ্রদ। তাঁর বিচার শুধু অদ্ভুত নয়, মারাত্মক ভুল, কারণ যাকে তিনি নিরিন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় বলেছেন তা দৈহিক, যেমন কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রেম, এবং যাকে তিনি ইণ্টুইশন্ বলেছেন, যেমন লাতিন-লেখকদের, তা ইণ্টিলেক্‌চুয়াল্। নলিনীবাবুর সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী পণ্ডিচেরীর আশ্রম-উদ্ভূত, এবং তাকে নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে Supra-conscious Super-soul-এর Super-neurotic অভিব্যক্তি, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এ ছাড়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, সুকুমার সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতি অধ্যাপক-বৃন্দের নাম বাংলা সমালোচনার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণ করার আদৌ প্রয়োজন হয় না, কারণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো সুদূর আভাষও তাঁদের সমালোচনার মধ্যে দুর্লভ। শ্রীকুমারবাবুর অধুনা-প্রকাশিত "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,"

শশাঙ্ক মোহন সেন-এর "বঙ্গবাণী" ও "বাণীমন্দির," বিশ্বপতি চৌধুরীর "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি পুস্তকে বিশুদ্ধ রসবিচারের সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ববিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হয়। ফলে সত্যকার সমালোচকের পথ হারিয়ে তাঁরা কর্ত্তব্যজ্ঞান-সচেতন 'শিক্ষক' হয়েছেন। শ্রীকুমারবাবু বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করেছেন, এবং রসবিচারেই তাঁর সমস্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হয়েছে। বিশ্বপতিবাবু 'রূপজগৎ,' 'অরূপের পথে', 'অরূপ', এই তিন স্তরের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের বিচার করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা দূরে থাক, এই ধরণের ধাপ ভাগ কোরে আলোচনা শুধু বিপজ্জনক নয়, অন্যায়। কারণ কাব্যকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে বুঝতে হোলে তার স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে আশ্রয় কোরে আলোচনা করাই শ্রেয়। আমরা অবশ্য এই স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির কারণ, অর্থাৎ পরিবেষ্টনের সঙ্গে কবি-মনের ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রমাভিব্যক্তিও অনুসন্ধান করব। দুঃখের বিষয় এইসব অধ্যাপক-সমালোচকদের রচনার মধ্যে সে-প্রয়াসের চিহ্ন তো নেইই, এমন কি রসবিচার করতে গিয়ে তাঁরা কেউ রসসৃষ্টি পর্য্যন্ত করতে পারেননি। তাঁদের তত্ত্ব-ক্লিষ্ট স্থবির ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশ্রমী কেতাব-কীটদের গলদ্‌ঘর্ম্ম করবার উপযোগী, সাহিত্যানুরাগীর মনোরঞ্জনের মতো তাতে কিছু নেই।

প্রাচীনের মোহমুক্ত হয়ে বাংলা সমালোচনাকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীনবাবু সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে শিল্পের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্বীকার করেছেন এবং সাহিত্যকে দৈবপ্রতিভার কবল থেকে মুক্ত কোরে পার্থিব আসনেই উপবেশন করিয়েছেন। "মনুষ্যধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের * মধ্যে সুধীনবাবু বলেছেন ঃ

শুনেছি, সাধনার এমন মার্গ আছে, যাতে চললে মানুষ মর্ত্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে অমৃত লোকে পৌঁছয়। এ-কথা সত্য কিনা জানবার সৌভাগ্য, সুযোগ বা সামর্থ্য

---

* শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁর "স্বগত" নামক পুস্তকের মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

কোনোদিন না-ঘটলেও, আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি যোগীদের এই দাবিতে আমার আস্থা যেন নিত্যকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি কিছুতে বুঝতে পারিনা, উক্ত সাধনার সঙ্গে কাব্য-চর্চ্চার সম্পর্ক কোথায়? প্রচ্ছন্ন প্রেরণাকে প্রকাশ্য ব্যঞ্জনায় পরিণত করাই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কার, সাধারণ অনুভূতির সীমা মানা ছাড়া কবির গত্যন্তর দেখিনা। রাক্ষস-শব্দের দ্বারা কোনো রমণীর দেবীত্ব জ্ঞাপন করতে চাওয়া যেমন উপহাস্য, মর্ত্ত্যের ভাষায় স্বর্গের বার্ত্তা ব্যক্ত করার চেষ্টা তার চেয়ে কিছু কম ব্যর্থ নয়।

এর পরেই তিনি যে আধুনিক সাহিত্যের ও কাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য :

গত দেড়শ বছর ধ'রে আমরা সাহিত্যের সার্ব্বিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমস্ত প্রয়াস প্রয়োগ করেছি কাব্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহক ক'রে তুলতে। ফলে কবি আজকে উৎকেন্দ্রিক, কাব্য মুমূর্ষু, সাহিত্য স্বীকারোক্তিতে পরিণত।

(ত্রৈমাসিক পরিচয়—বৈশাখ ১৩৩৯)

দুঃখের বিষয় এই তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বলিষ্ঠ পৌরুষপূর্ণ ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিবাদের নির্জ্জন গোরস্থানেই কবরিত করেছেন। সমাজের নিষ্ঠুর পরিবেষ্টনে তাঁর মতো 'দুর্ব্বলের' উচ্ছেদ অনিবার্য্য জেনে তিনি ব্যক্তিপূজায় তনুমন উৎসর্গ করেছেন, ভবিষ্যৎকে ভুল করেছেন 'ভবিতব্য' বোলে, এবং তাঁর এই নির্ব্বিকার আত্মরতিতে পাছে আঁচড় লাগে সেই ভয়ে তিনি শশকবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেছেন। সমালোচক হিসাবে তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে মার্কস্‌পন্থী হোতে পারেননি, কারণ মার্কস্‌ও তাঁর বিবেচনায় 'যথেষ্ট জড়বাদী' নন। তাই শ্রেণী-বিরোধ অস্বীকার করতে না পেরেও, এবং অস্বাভাবিক অধিকার ভেদে সৌসাদৃশ্যের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব জেনেও, তিনি সাম্যবাদী নন স্বীকার করেছেন, এবং নিজেকে বলেছেন 'একেবারে বুর্জ্জোয়া'। তাঁর সমালোচনার ভাষাও তাই সরল তেজস্বীতা বর্জ্জন কোরে জটিল দুর্ব্বিসহ দুর্ব্বোধ্যতাকে কেন্দ্র কোরে শুধু প্রাণহীন প্রজ্ঞাপ্রেমিকের স্বগতোক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি থেকে তাঁর মুক্তি সম্ভব কিনা ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হবে, কিন্তু আজ আমাদের তাঁর কাছে নূতন সমালোচনার ভাষা ও ভাবের জন্যে ঋণ স্বীকার করতেও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

তারপর "চতুরঙ্গ" ও "কবিতা" পত্রিকার সমালোচক-গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু। যেহেতু দৈবশক্তিতে এরাও আস্থাবান নন, সেইজন্য এঁদের সমালোচনাও সমাজ ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী। কিন্তু বহু চোখ-ঝল্‌সানো আলোর রেখায় দিশাহারা হয়ে এঁরা কখন ঘুরেছেন 'শিল্প শিল্পীর জন্যে' এই মতবাদের চারিদিকে, কখন সমাজ জরাগ্রস্ত বোলে, তার জরা, কদর্য্যতা ও বীভৎসতাকেই 'বাস্তব' বোলে প্রতিপন্ন করেছেন, এবং তারস্বরে তাকেই ঘোষণা কোরে বর্ত্তমানে প্রগতিশীলদের নেতৃত্ব দাবী করেছেন। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির বর্ত্তমান ধারা এবং সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ 'হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানির' মতো এঁদের ঝলসিয়ে দিয়ে কেবল অনর্গল বিকৃত মনের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। তাই সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, বুর্জ্জোয়া ভণ্ডামী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ত্রি-সঙ্কটে পড়ে' এই উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, পরস্পরের পিঠে হাত বুলান, আর বাইরের পাঠকের কাছে পঙ্গু সমাজের সভ্য বোলে আত্ম-পরিচয় দিয়ে নিজেদের পাণ্ডুর, বিবর্ণ সাহিত্যকে বাস্তবের মুকুর, সুতরাং প্রগতিশীল, বোলে যুক্তির পর যুক্তি দিতে থাকেন। বাংলা সমালোচনা আজ এই স্বার্থপর গোষ্ঠী-নিন্দা ও গোষ্ঠী-পৃষ্ঠপোষকতা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

১৮১৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয় কি?

এতে হতবাক্‌ হবার কিছু নেই। বাংলাদেশ আজও পুরোপুরি মধ্যযুগের সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারেনি। ইংরেজী-সভ্যতার চাপে বাণিজ্য-প্রসারণের মধ্যে যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা জন্মলাভ করেছে, তার আশ্রয় হয়েছে প্রধানত সহর ও অর্দ্ধ-সহরগুলি। তার বাইরে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে আজও ছোট ছোট গ্রামগুলি, জমীদার আর পত্তনীদারেরা সেখানকার অভিভাবক, মূর্খ অপগণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবী সেই গ্রাম্য সমাজ-জীবনের মালিক, আর মন্দিরে মন্দিরে, মস্‌জিদে মস্‌জিদে, ভগবান-আল্লা তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক আজও অশিক্ষিত ও অমানুষ। ধনিক-সভ্যতার চাপে পড়ে', গ্রাম ছেড়ে

সহরে যারা এসেছে তাদের জীবনযাত্রারও কোনো বৈচিত্র্য নেই, কারণ এ-দেশের ধনিকগোষ্ঠী ধনবৃদ্ধির লোভে ও উত্তেজনায় যেমন বিদেশীর পদলেহন করেছে, তেমনি অকালে ও অসময়ে, যুগের দ্রুত পরিবর্ত্তনের চাপে, পরিপক্কও হয়েছে বেশী। আর মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর পিঠচুলকানি ও প্রলোভনে যাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পদে উন্নীত হয়েছেন তাঁরা যেমন প্রভুর সঙ্গে সুর মিশিয়ে স্বদেশের কাল্পনিক 'দেবীমূর্ত্তি' ধ্যান কোরে 'মা, মা' বোলে চীৎকার করেছেন, তেমনি হঠাৎ-সৌভাগ্যের দীপ্তিতে না পেরেছেন নীচে নামতে, না পেরেছেন উপরে উঠতে। শুধু যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠুর ঘাতপ্রতিঘাতে ধনিকগোষ্ঠীর প্রলোভনকে মরীচিকা বোলে চিনলেন এবং ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে অবরোহণ করতে লাগলেন তাঁরাই আদর্শের দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে সত্যটিকে চিনে নিজেদের জীবনকে মিলিয়ে দেখলেন কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাকি যাঁরা রইলেন, ধনিকগোষ্ঠীর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়েও যাঁরা নীচে নেমে আসতে রাজী হোলেন না, তাঁরা আত্মাভিমান আর আত্ম-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, দেশ, মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সবকিছুকে দুর্ব্বাসার মতো অভিশাপ দিতে লাগলেন। প্রশ্ন করলে তাঁরা জবাব দেন : "কি করব, সমাজ-বিবর্ত্তন যতদিন না ঘটছে ততদিন এই জাহাঁবাজ গ্রাম্য-বৃদ্ধার মতো গালি আর অভিশাপ দেওয়া ভিন্ন আমাদের নান্য পন্থা।" অর্থাৎ সমাজের বিবর্ত্তন ঘটিয়ে প্রচলিত "দিল্লীর লাড্ডুর" মতো তাঁদের হাতে সুন্দর সমাজ উপহার দিতে হবে, তবেই তাঁরা আশার বাণী শুনিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন। বলা বাহুল্য, 'কবিতা' ও 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা এই "দিল্লীর লাড্ডু" প্রাপ্তির আশা করেন, এবং সমাজের অন্তমান্ দিকটিকে, বীভৎস ও বিকৃত ছবিগুলিকে, বিকৃততর ভঙ্গীতে প্রকাশ কোরে, 'প্রগতিশীল' হোতে চান। বাংলাদেশের উপনিষদীয় ও সাংস্কৃতিক সাহিত্য-বিশ্লেষণের কারণও যেমন বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আজও রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের ফ্যাশানেবল্ প্রগতিবাদীদের উল্লম্ফন ও অহম্-গর্ব্বিত জৃম্ভণের কারণও হঠাৎ-বর্দ্ধিত ধনিক সভ্যতার অকালপক্কতা ও সাম্যবাদের গণ-নেতৃত্বের পুরোপুরি অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে

রয়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ যখন দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ কোরে জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তখন দেখা যাবে এই "দিল্লীর লাড্ডু্র" বরপ্রার্থীরা বৃন্তচ্যুত ফলের মতো টুপ্-টাপ্ কোরে খসে' পড়েছেন, আত্মহত্যা করেছেন, আর না হয় স্বদেশপলাতক হয়ে কুৎসাপ্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। সোভিয়েট্ রুষিয়ায় বিপ্লবোত্তর যুগের এই মধ্যবিত্ত-মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসেই এ-সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীরাও তার প্রমাণ দিচ্ছেন।

নূতন সমালোচনার পদ্ধতি পূর্ব্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। নূতন বাংলা সমালোচনা এই পদ্ধতি মেনে অগ্রসর হবে। তাই নূতন সমালোচনা, অর্থাৎ সাম্যবাদী বাংলা সমালোচনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনেক। প্রথমত সাম্যবাদী সমালোচনার প্রথমাবস্থায় তার স্বরূপটি ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতে হবে সমগ্র পৃথিবী থেকে তার যথার্থ উপকরণ সংগ্রহ কোরে বাংলা ভাষায় আপনার কোরে প্রকাশ কোরে। দ্বিতীয়ত সাবধান হয়ে ধীর শান্ত ভাবে সত্যকার সাম্যবাদী সাহিত্য সমালোচনা করতে হবে, কারণ সামাজিক ব্যবস্থায় যেটুকু পরিবর্ত্তন এসেছে, সাহিত্যে বা সমালোচনাতে ঠিক ততখানি এখনো আসেনি, আসতে পারেও না। সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা এখনো মধ্যযুগের যোগাসনে সমাসীন রয়েছে, হঠাৎ তাকে ধ্যান ভঙ্গ কোরে সমাজ ও প্রত্যক্ষ জীবনের প্রস্তর ভিটের উপর দাঁড় করালে সাময়িক কলকোলাহল ও আর্ত্তনাদে পরিপার্শ্ব মুখরিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে থম্‌কে থাকলে চলবে না, কারণ ঐতিহাসিক সত্যের আলোক-বর্ত্তিকা বহন কোরে এগিয়ে যাওয়ার ভার যাঁদের উপর পড়েছে, সাময়িক দুর্য্যোগ বা ঘূর্ণীবাত্যায় তাঁরা যেমন বিপথগামী হবেন না, তেমনি ভয়-সঙ্কুচিত হৃদয়ে হতবাক্‌ও হবেন না। ফলাফল ইতিহাস প্রমাণ করবে। আর ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের দুর্নিবার বেগে বাংলাদেশের মধ্যযুগের শিথিল স্তম্ভগুলিই শুধু যে ভাঙনের শব্দ করছে তা নয়, অকালবৃদ্ধ ধনিকশ্রেণীও শ্রেণী-মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখছেন, এবং বর্দ্ধিষ্ণু সাম্যবাদ তার অনিরুদ্ধ ঐতিহাসিক গতিতে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে অগ্রসর হোচ্ছে। সাম্যবাদের বিরোধী যাঁরা তাঁরাই এ-কথা স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন আলংকারিকেরা বলেন রস এক ঘন আনন্দস্বরূপ চেতনা, কোনো বিষয়ান্তরের স্পর্শে তার প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভে ও মোহে আচ্ছন্ন কোরে রাখে, তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত কোরে সত্ত্বরূপে এর প্রকাশ হয়। সুতরাং রসের আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর। প্রাক্-পৌরাণিক যুগের এই বাণী উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন, এবং বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাই তাঁদের সে-প্রকাশের প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু আজ বাংলার সহরের আকাশ বাতাস কল কারখানার ধোঁয়ায় ম্লান, আজ আর সূর্য্যের কিরণ ইমারতের ফাঁকায় ফাঁকায় ঝিকিয়ে বা ঝলমলিয়ে যায়না, ধুলিধূসর বস্তিতে এসে লজ্জায় স্বস্থানে ফিরে যায়, আজ আর পাল্কি বেহারার হাঁইহুঁই বা সহিসের হেঁইও হাঁক অলিগলি বা বড়ো রাস্তা থেকে শোনা যায় না, বড়ো বড়ো অফিসের আর অট্টালিকার ভিৎ-গঠনের "ঠ্যালো রে জোয়ান্ হেঁইও" শব্দ জনতায় ভেসে আসে, আজ আর সন্ধ্যাবেলায় বুড়ি দাসীর কাছে বসে' প্রদীপ জ্বেলে রূপকথা শোনা যায় না, দিনের খররৌদ্রে হাজার হাজার মানুষের 'ইনক্লাব' ধ্বনির মধ্যে ইতিহাস গুরুর কাছে এক নূতন 'রূপকথা' শুনি, যার রাজকন্যা আর রাজকুমার ঐ মিছিলের প্রত্যেকেই, আর 'স্বপনপুরী' যারা এই মাটির বুকেই গড়বে নিজের হাতে। আজ তাই নিস্তব্ধপ্রায় জগতে আর কোণের মানুষ, লাজুক বা নীরব হয়ে থাকা চলে না, কারণ যে জীবন-উপনিষদের শ্লোক বাল্যকাল থেকে আমরা আবৃত্তি করছি তার মধ্যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ' বাণী নেই, আছে এর ঠিক বিপরীত কর্কশ বাণীটি। আজ তাই নূতন সাহিত্যকেও যেমন লজ্জা ভেঙে নীরব ঘরের কোণটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে জনতার মধ্যে, তেমনি নূতন সমালোচনাও প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সামনে ও পিছনে ইতিহাসের সুদূর-প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে, বাস্তবের সমগ্রতাকে উপলব্ধি কোরে প্রচার করবে, খণ্ড ও বিকৃত 'বাস্তব' নিয়ে মাতলামি করবে না। সেই পরিপূর্ণ বাস্তব মানবেতিহাসের অন্তরোৎসারিত জীবনের মন্ত্র, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে পরাজিত করবার মন্ত্র, যা আজ মানুষের ইতিহাসই 'সাম্যবাদের'

সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজের মধ্যেই ধ্বনিত করেছে। নূতন সমালোচনা তাই সাহিত্যে জীবনের মালিন্যের অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করবে সমাজ ও সভ্যতার নিষ্ঠুর এবং অবশ্যম্ভাবী অবদান বা অভিশাপ বোলে, কিন্তু তাকে 'সত্য' বোলে প্রতিষ্ঠিত হোতে দেবে না, এবং যে-সাহিত্য তাকে 'সত্য' বোলে ঘোষণা করবে, নূতন সমালোচক বা সাম্যবাদী সমালোচক তাকে 'বিরাট মিথ্যা' ও ব্যাধিগ্রস্ত রুগীর প্রলাপ বোলে প্রচার করবে। নূতন বাংলা সমালোচনার এই হবে পথ, এবং সে-পথ কুসুমাস্তৃত না হয়ে কণ্টকাকীর্ণ হবে বোলে নূতন সমালোচকের বিলাপ করা চলবে না।

সমরোত্তর ইংরেজী কাব্য

এ-কথা আজ অবিসংবাদিত সত্য যে, যে-কোনো দেশের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগ থাকবে। এই যোগাযোগ অবশ্য ইতিহাসই স্থাপন করেছে, কারণ ভৌগলিক বেষ্টনীকে অতিক্রম কোরে বিশ্বমানবকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত করেছে পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাস, এবং মানুষ তাই প্রাক্তন দেশ-জাতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও একান্নবর্ত্তী এক বিশাল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হোতে চলেছে। এ-যুগে তাই কোনো বিচারই, সাহিত্যেরই হোক বা রাজনীতিরই হোক, এক নির্জ্জন কোটরে বসে' করবার উপায় নেই। জাত্যাভিমানের উদ্ধত শিরে প্রগতিশীল বিজ্ঞান যে নির্ম্মম কুঠারাঘাত করেছে তার ফলাফল ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, আজ আমাদের দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের বিচার বা বিশ্লেষণ করতে বসে' বাইরের দিকে না তাকিয়ে উপায় নেই। কোটরাভিমুখী মন যদি অন্ধ থাকবার উপদেশই দেয়, তাহোলে সাহিত্যিকেরা বিদ্রূপই করবেন, এবং লোকষানের অঙ্ক আমাদেরই বাড়তে থাকবে, তাঁদের নয়।

বাংলাদেশের মাইকেল মধুসূদনের ঋণ মিল্টন বা হোমারের কাছে যতই থাক না কেন, এ-যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে ইংল্যাণ্ডের লেক-স্কুলের কবিদের প্রতিভামুগ্ধ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, এবং তার সঙ্গে উপনিষদ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসও তাঁর স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। সুতরাং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিরা সমুদ্রপারের সমরোত্তর যুগের কবিদের কাছ থেকে যে প্রেরণা পাবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাছাড়া সমসাময়িক ইতিহাসও তাঁদের এই সম্প্রীতি-স্থাপনে সহায়তা কম করেনি, কারণ সমরোত্তর যুগের ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ শুধু য়ুরোপ বা আমেরিকার তটেই আঘাত খেয়ে ফিরে আসেনি, সমস্ত পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে। অর্থনৈতিক সংকটের কঙ্কাল মূর্ত্তি শুধু ইংলিশ চ্যানেল্, ভূমধ্যসাগর, আত্‌লান্তিক বা প্রশান্ত মহাসাগর পার

হয়েই মানুষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করেনি, এ-দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকেও বিপর্য্যস্ত করেছে। এবং যেহেতু ইতিহাস সমবেগধর্ম্মী অটোমেটন নয়, তার গতির তারতম্য আছে, সেহেতু সামাজিক আন্দোলনও ঐতিহাসিক সূত্রের বর্ণ মেনে চলে না, অনেক সময় বেগের প্রচণ্ডতায় তাকে লঙ্ঘন কোরে যায়। বর্ত্তমানে ফ্যাশিষ্ট য়ুরোপ আর সম্মিলিত সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট্ রিপাব্লিকস্ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেইজন্য ভবিতব্য-বিশ্বাসীরা ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাসবাণীকে মুচ্কি হেসে উপহাস করলে যেমন ভুল করবেন, তেমনি ইতিহাসের বিশ্বস্ত শিষ্যবর্গও ভারতবর্ষের বা বাংলাদেশের অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক রূপ দেখে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের আলোচনাকে বিলাসিতা বললে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। বহির্জগতের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতই যখন আমাদের মূল অনুপ্রেরণার উৎস, তখন আজ বাংলাদেশেও সাহিত্যিকদের উপকরণ অন্য দেশবিদেশের তুলনায় একেবারে অগ্রাহ্য নয়। এক কথায় বলা চলে এ-যুগের 'Mood' হোচ্ছে 'সাম্যবাদ', এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদেশে যেমন সাম্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ও ষড়যন্ত্রে রয়েছে, এদেশেও ঠিক তেমনি জরুরী আইনের দৌরাত্ম্যে, দেশীয় নৃপতিকুল ও ধনিকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর পলায়নী মনোবৃত্তিতে, এবং শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর গণচেতনায় স্পষ্ট রয়েছে। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ মেনে রাজনৈতিক কর্ম্মীরা হয়তো একটু পা অদলবদল করতে পারেন, কিন্তু শিল্পীর বা সাহিত্যিকের ক্ষেত্রের প্রসার যখন বৃহত্তর তখন শ্রেণীধর্ম্ম রক্ষা কোরে পৃথিবীর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে তাঁর বিশেষ বাধা নেই। সুতরাং বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে হয়তো অন্যায় কিছু হবে না।*

আধুনিক কাব্য আধুনিক ও কাব্য দুইই। সুতরাং আধুনিক কাব্যের

* ইংরেজী কবিদের বা কাব্যের এখানে বিস্তারিত আলোচনা আমি করব না, কারণ এই বইয়ের মধ্যে আমি বৈদেশিক বা সাহিত্য-আন্দোলনের আলোচনা সেইটুকুই করেছি যেটুকু বাংলাদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপোপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে। এখানে শুধু সমরোত্তর ইংরেজী কাব্যের এমন কয়েকটি মূলধারার ও বিশেষ প্রকৃতির পরিচয় দেব, যাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রূপটি বোঝা সহজ হয়।

আলোচনা করতে হোলে শুধু 'কাব্যের' গুণগুলি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করলে যেমন তার অনেক মাধুর্য্য অন্তর্ধান করবে, তেমনি শুধু আধুনিকতার উপকরণগুলি অনুসন্ধানের পূর্ব্বে 'কাব্য' কি না তা যাচাই কোরে না দেখলে সমালোচনাই ব্যর্থ হবে। কাব্যের 'উপকরণ' এবং কাব্যের 'গুণ' কোনটাই অপরিবর্ত্তনীয় নয়, এ-কথা সামান্য একটু চিন্তা করলেই 'সত্য' বোলে মনে হবে। উপকরণ পরিবর্ত্তনশীল, কারণ কাব্যের উৎস যে বহির্জগৎ তা পরিবর্ত্তনশীল। কাব্যের উদ্দেশ্য বা 'গুণ' নির্ভর করে মানুষের মনে কবির অনুভূতি সঞ্চারিত করার সার্থকতায়, আনন্দ, বেদনা, করুণা, যাই হোক। আজ যাতে যে-ভাবে আমরা আনন্দ বা দুঃখ পাই, নিশ্চয় পঞ্চাশ বছর আগে তাতে সেরকম আনন্দ পেতাম না, পেলেও গভীরতার ও গ্রহণের অনেক তারতম্য ছিল। অতএব অনুভূতির উদ্দীপনার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার রূপও বদলাচ্ছে, তখন শুধু 'আনন্দ পাওয়া' বা 'দুঃখ পাওয়া' এগুলির বিশুদ্ধ সত্তার জীর্ণ খুঁটির উপর ভর দিয়ে কাব্যের অপরিবর্ত্তনীয়তার সমর্থনে দার্শনিক তত্ত্বের আর্ত্তনাদ করা অর্থহীন। মানুষ চিরদিনই আনন্দ পাবে, দুঃখ পাবে এবং মানুষও থাকবে একথা বলা আর উদ্দেশ্যহীন কথার মালা গাঁথা এক, কারণ প্রত্যেকটারই রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হোচ্ছে। সুতরাং কোনকিছু নিশ্চল মানদণ্ড দিয়ে কাব্য বা মানুষের কোনো শিল্পকেই বিচার করা যায় না এবং সেইজন্যই প্রথম বক্তব্য হোচ্ছে যে আধুনিক কাব্য আধুনিক ও কাব্য দুইই।

বস্তু ও মনের সক্রিয় বিরোধে যেমন মানুষ ও তার জ্ঞানের বিকাশ, তেমনি বহিরঙ্গ ও অন্তরাত্মার আবর্ত্তনে কাব্যেরও বিকাশ। কাব্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্ত্তনের ছন্দে কাব্যের আঙ্গিকের রূপ নির্দ্ধারিত হয়, এবং শুদ্ধ আঙ্গিক বা বিষয়ের প্রাণহীন সাধনা কাব্যের স্থবিরত্বের পরিচায়ক। অর্থাৎ বিষয় (Content) ও অঙ্গ (Form) পরস্পর-সংলগ্ন। তাই কাব্যের দরজায় যখন আবেগ এসে আঘাত করল, তখন তাকে অন্দর মহলের পথ দেখিয়ে প্রস্থান করল যুক্তি, এবং পরিপাটি, সৌষ্ঠব ও গাম্ভীর্য্য যখন ক্ল্যাসিসিজম্-এর সঙ্গে অন্তর্ধান করল, তখন রোমান্টিসিজম্-এর সঙ্গে আবির্ভূত হোলো স্বাধীনতা, বিস্ময় ও চমৎকারিতা। এইভাবে বিষয় ও

প্রকাশ-ভঙ্গীর বিচ্ছেদে ও মিলনে কাব্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের পরিমিত ও নিয়মিত ছন্দ তৎকালীন পৃথিবীর যান্ত্রিক রূপেরই প্রতিভাসন, গণিত ও জ্যোতিষের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ফ্রান্স ও আমেরিকার বুকের উপর দিয়ে বিপ্লবের ঝড় বয়ে গেল তখন কবিরাও প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কোরে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বন্দনাগান গাইতে আরম্ভ করলেন। সুন্দরতম পৃথিবীতে সবই সুন্দর,—প্রাচীনদের এই মোলায়েম ধারণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন রোমান্টিক কবিরা, এবং তাঁরা অনুভব করলেন শেলীর মতো, 'A heaven of serene and mighty motion,' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর মতো, 'a sense sublime of something far more deeply interfused.' কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনরায় সেই যান্ত্রিক ধারণা ফিরে এল, এবার আর পদার্থবিদ্‌দের জন্যে নয়, প্রধানত যাঁরা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তাঁদের ও জীবতত্ত্ববিদ্‌দের জন্যে। দেখা গেল মানুষের আবিষ্কৃত যন্ত্র তার মুক্তি সাধনের ব্রত পালন না কোরে শৃঙ্খলিত করছে মানুষকে, স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তে মাথা তুলছে ভেদবুদ্ধি ও বৈষম্য। তার সঙ্গে দেখা গেল ডারুইন্‌-এর সিদ্ধান্ত—"শক্তির জয় সর্ব্বত্র"—দেবতাকে তুষ্ট না কোরে যন্ত্রের শক্তিমান মালিকদের আত্মপ্রসাদ লাভে সহায়তা করছে। সুতরাং ম্যাথু আর্নল্ড

> This strange disease of modern life
> With its sick hurry, its divided aims.

—সহ্য করতে না পেরে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়ে বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, এবং টেনিসন্‌ "When through the wood noble savage ran"-এর কল্পনা পরিত্যাগ কোরে ড্রাইডেন্‌কে অতিক্রম কোরে দেখলেন

> Nature, red in tooth and claw
> With ravine, shriek'd against his creed.

প্রায় একশত বছর পরের দুঃসহ দুঃস্বপ্নের আভাষ দিয়ে গেলেন এঁরা এবং দৃশ্যমান্ পৃথিবীর তৎকালীন বৈকল্যেই যখন আর্থারের কাল্পনিক নাইট-যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করা কোনো কোনো কবি নিরাপদ মনে করেছিলেন, তখন

ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক কবিরা ঘরে বাইরে কলুষ ও কদর্য্যতার পূর্ণবিকাশ দেখে মধ্যযুগের গির্জ্জার অভ্যন্তরে বা ব্যক্তিত্বের বিলাসকক্ষে প্রবেশ করবেন তাতে আর বিস্ময়ের আছে কি ?

সেই সময় আমেরিকায় একজন 'Bostonian', এড্‌গার এলান্‌ পো, কাব্যের নীরব সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, এবং তাঁর কাব্যের এমন গুণ ছিল যার জন্যে তাঁকে 'a poet without a neighbourhood' বলা হোত। এই প্রতিবেশীহীন কবি প্রায় সত্তর বছর আগে কাব্যের যে-রূপ আরাধনা কোরে গিয়েছিলেন, সমসাময়িক রসিকেরা তার মূল্য যাই দিয়ে থাকুন না কেন, মহাসমুদ্রপারে ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার সেই রূপই ধ্যান করেছিলেন, এবং তাঁর পরবর্ত্তী কবিরা, মালার্মে ও ভের্লেন্‌, সেই রূপপূজার উপাচার সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর চ্যানেলপারে ইংল্যাণ্ডের কবি এলিয়ট্‌ এমনভাবে সেই কাব্যমূর্ত্তিকে অর্ঘ্য দিলেন যে সাম্প্রতিক কবিরা আজও তার মোহ কাটাতে পারেননি। এলান পো কল্পিত, বোদ্‌লেয়ার পূজিত, মালার্মে ও ভের্লেন্‌ অর্চ্চিত, এলিয়ট্‌ ধ্যাত সেই কাব্যমূর্ত্তিকে বলা হয় Symbolist Poetry, বা রূপক কাব্য। এলান পো-র কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অপ্রাকৃতিক অনুভূতি সঞ্চারণে। ক্রমবিলীয়মান প্রতিরূপ-সমষ্টি ও শব্দ-সঙ্গীতের সাহায্যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ ও ক্ষণস্থায়ী মানস-পুতুলগুলিকে রূপায়িত করবার জন্যে চেষ্টা কোরে তিনি "রূপক" কাব্যের ভিৎ গঠন কোরে গিয়েছিলেন। যেমন—

> Up many and many a marvellous shrine
> Where wreathed friezes interwine
> The viol, the violet, and the vine

—এর মধ্যে যে "ব্যঞ্জনা" আছে তা শুধু শব্দবয়নের মধ্যে নেই, শব্দ-সংশ্লিষ্ট ভাবের মধ্যেও আছে। এলিয়টী ও সাম্প্রতিক কাব্য এরই পরিবর্দ্ধিত রূপ।

অসুস্থ দেহ ও মন নিয়ে এলান্‌ পো যখন ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণার অনুভূতি কাব্যে রূপায়িত করছিলেন, তখন আর একজন মার্কিন্‌ কবি, ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান্‌, অপরিসীম আনন্দে ও উৎসাহে দেশ ও কালের সঙ্গে আত্মীয়তা

স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছিলেন তাঁর কাব্যের স্বাভাবিক সারল্যে ও স্ফূর্তিতে। তাই এলান পো-র সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে "Vulture, whose wings are dull realities" না বোলে, উদ্দাম ভাষায় অভিনন্দন জানালেন —"Hurrah for positive science! long live exact demonstration!" বোলে, এবং কাজের দৈহিক প্রসাধনে মন না দিয়ে তার উপর ধর্মের গুরুত্ব আরোপ করলেন। অবশ্য এমিলি ডিকিন্‌সন্‌-এর মতো স্বাতন্ত্র্য-সচেতন কবির অনাদর তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু জেরার্ড ম্যান্‌লে হপ্‌কিন্স্‌-এর সমাদর তার চেয়ে বেশী মূল্যবান, যেহেতু সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে যাঁরা এলান পো ও এমিলির মতো 'unique' কাব্যের ছায়াতল ছেড়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারণের সাহস সঞ্চয় করেছেন হপ্‌কিন্স তাঁদের প্রিয়, কারণ হপকিন্স্‌ তাঁর নিজের ভাষায় "in a manner...a Communist."

বিগত মহাযুদ্ধ কবিদের মন ফিরিয়ে আনল বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে। বার্গসঁ ও ফ্রয়েড্‌ প্রমুখ দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকেরা তাঁদের প্রলুব্ধ করলেন অবচেতনার অতল গহ্বরে ডুব দিয়ে ব্যক্তিগত বাষ্পাকুল সংবেদন ও আবেগ আহরণ করতে। কিন্তু শুধু বার্গসঁ ও ফ্রয়েড দিয়েই কবিদের এই অন্তর্মুখী মনের পরিচয় দেওয়া যায় না, কারণ সংবেদন বা আবেগ যতই একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় কোরে থাকুক না কেন, বহির্জগতের কোনো অঙ্কুশের (Stimulus) ঘা না লাগলে সে-অভিজ্ঞতা কবির পক্ষে লাভ করা কি কোরে সম্ভব হবে? এ-পৃথিবী তো আর উন্মাদের এসাইলাম্‌ নয়, তাহোলে হয়তো সম্ভব হোত। সুতরাং বাইরের দৃশ্যমান্‌ পৃথিবীতে কোনো উদ্দীপক থাকা প্রয়োজন, তবেই অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব, এবং তাকে কেন্দ্র কোরে নানারকমের সংবেদন ও আবেগ। মহাযুদ্ধজাত নিউরসিস্‌ রক্ষার জন্যে এটা একটা কবিদের বা শিল্পীদের defense mechanism বা রক্ষাস্ত্র বলতে হবে। যুদ্ধের পর যে বিশাল শূন্যতায় ও রিক্ততায় পরিপার্শ্ব পরিণত হোলো তার মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া শ্রেণীর কবিরা স্বশ্রেণীর বিরাট ভণ্ডামি, অন্তঃসারশূন্যতা, ন্যায়বিচার ও ন্যায়াদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখলেন বটে, কিন্তু অস্থিতে অস্থিতে বদ্ধমূল শ্রেণী-সংস্কার সশস্ত্র প্রহরীর মতো তাঁদের মুক্তির

আগ্‌লে রইল। বাইরের এই বিরাট পৃথিবীর একটি কোণেও যাঁদের স্থান হোলো না, যাঁরা কোল পেলেন না মানুষের কাছে ও জগতের কাছে, স্বশ্রেণীর মাসতুতো ভাইদের প্রত্যক্ষ দিবালোকের রাহাজানিতে যাঁরা আকৃষ্ট হোলেন না, তাঁদের আর উপায় কি? একমাত্র উপায় হোলো নিজের অন্তরের থম্‌থমে স্তব্ধতায় ফিরে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নীড়ে ক্ষিপ্রগতি সংবেদন ও অন্তর্বেগের গোধূলি অন্ধকারে ডানা গুটিয়ে বসে' থাকা আর তা না হোলে আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হয়ে প্রাক্তনের কোলে কল্পনার অবসন্ন পাখায় ভর দিয়ে ফিরে যাওয়া।

এই নূতন সমরজাত বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য, পলায়নী মনোবৃত্তি ও ফাঁপা আত্মচেতনাকে কাব্যে রূপায়িত করতে হবে, সুতরাং কাব্যের অঙ্গের পরিবর্ত্তনও আবশ্যকীয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত সংবেদন ও আবেগের সূক্ষ্মতম স্পন্দনও কাব্যে অনুরণিত হবে, তাই ইংল্যাণ্ডের নূতন কবি এলান পো, বোদ্‌লেয়ার, মালার্মে, ভের্লেন্‌-এর পথ অনুসরণ কোরে দ্রুতসঞ্চরণশীল প্রতিরূপ-সমষ্টি পাঠকের কাছে মানসিক দুরবিনে দেখাতে চাইলেন। শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম কোরে নূতন কবি তার আনুষঙ্গিক ভাব ও অর্থের নির্দ্দেশ দিলেন কাব্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হোলো তাঁর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের পাণ্ডিত্য, আর চলচ্চিত্র ও রেডিওর অদ্ভুত আবেদন। বিপদ হোলো সাধারণ পাঠকদের, যাঁরা আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষিত, কিন্তু যে নূতন কাব্য সৃষ্ট হোলো তাকে বলা হোলো Symbolist Poetry বা রূপক কাব্য। শব্দের রঙ আছে, সুর আছে, শ্রেণী আছে, ইতিহাস আছে; শব্দবুনুনিতে আছে কবির মানসিক খেয়াল, ক্ষণিকের আবেগ, বিলীয়মান সংবেদন; এবং এই সবকিছুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে যে-কাব্য সৃষ্ট হোলো তার অন্তর ও বাহির দুইই দেখতে হবে মানসিক দুরবিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। ফাঁক থাকবে হয়তো, কিন্তু সে-ফাঁক সঙ্গীতের তাল, ফাঁক, সোম-এর মতো, রেশটা না হারালে সমগ্রতার রূপ ফুলের মতো ফুটে উঠবে। কথাটা একটু জটিল হয়ে গেল। পরিষ্কার কোরে বুঝতে হোলে আধুনিক সিনেমার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চলচ্চিত্রের আধুনিক পরিচালকের সঙ্গে 'রূপক'

কবির সাদৃশ্য আছে, সুতরাং চলচ্চিত্রের কয়েকটা টেক্‌নিক্‌-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

চলচ্চিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে "The art of leaving out"—অর্থাৎ ফাঁক রাখার কৌশল। খ্যাতনামা পরিচালকেরা বলেন যে, যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে সিনেমার উদ্দেশ্য হবে "Don't say it all. Don't treat your public as a collection of dumb-bells." অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় সব বলা হবে না, নায়কনায়িকার মুখ দিয়ে, দৃশ্যের ভিতর দিয়ে কিছুটা প্রকাশ করা হবে, বাকিটা ভরাট কোরে নিতে হবে দর্শকদের। সিনেমার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হোচ্ছে Continuity ও Conjunction.. কোনো একটি দৃশ্যে দু'টি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে যদি একটি তৃতীয় চরিত্রের নাম করা হয় এবং পরবর্ত্তী দৃশ্যে সেই তৃতীয় চরিত্রকে প্রকাশ করা হয় তাহোলে চলচ্চিত্রের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষিত হবে। যেমন পর্দ্দায় একজন তার এক প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গান গাচ্ছে, সামনে সেই মেয়েটির ফটো রয়েছে। এই দৃশ্যটির ভিতর থেকে যদি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে (Dissolve) সেই মেয়েটি তাহোলে ছবির continuity বজায় থাকবে। তারপর ধরুন একটি চরিত্রের মুখে আমরা শুনলাম যে গল্পের নায়ক ট্রেনে কোরে আসছে। দেখা গেল যে মেঝের উপর সেই নায়কের ছোট ছেলেটি খেল্‌না-রেলগাড়ী নিয়ে খেলা করছে। ক্যামেরাতে সেই ছোট খেলার গাড়ীটি "pick up" কোরে নিয়ে 'dissolve' বা 'wipe' কোরে দেখানো হোলো চলন্ত ট্রেনের ঘূর্ণায়মান চাকা, তারপর তার থেকে 'dissolve' কোরে দেখানো হোলো একটি কামরার মধ্যে সেই নায়ক বসে আছে। একে বলা হয় 'continuity preserved by conjunction', অর্থাৎ এখানে সুন্দর সংযোজনায় ছবির অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করা হোলো। পরিচালকের কৃতিত্ব এর উপর নির্ভর করে। নাম না করতে করতে যদি উক্ত দৃশ্যে দেখা যেত যে নায়ক চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে' আছে, তাহোলে বুঝতে হোত যে পরিচালকের বুদ্ধি ভোঁতা। প্রথমটিতে দর্শকের মন ও চোখ খেলাগাড়ীতে থিতিয়ে, ঘূর্ণায়মান চাকায় অভ্যস্ত হয়ে তবে চলন্ত কামরার নায়ককে ছাখে, কোনো 'jump'-এর জন্যে চোখে বা মনে আঘাত লাগে না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে চোখের

ও মনের উপর চলন্ত ট্রেন হুড়মুড় কোরে এসে পড়ে। অথচ পৃথকভাবে টয়-ট্রেনটির দৃশ্য কিন্তু অর্থহীন। সিনেমার টেক্‌নিক্-এর এটা একটা বিশেষ মূল্যবান দিক। এ ছাড়া Camera Angles আছে। ক্যামেরার সাহায্যে বুদ্ধিমান পরিচালক অর্থ বা তাৎপর্য্য বোঝাতে চান। The Fall of St. Petersburg নামক রুষীয় ছবিতে যখন কৃষকটি তার মেয়েকে নিয়ে সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গ্-এ এল তখন পরিচালক সবচেয়ে উঁচু একটা বাড়ীর ছাদ থেকে তাদের ছবি তুললেন, তারা মার্কেট্ স্কয়ারের দিকে হেঁটে চলেছে। ছবিতে এই দু'জনের চেহারা বিশাল একটা জায়গার উপর পতঙ্গের মতো ক্ষুদ্র দেখাবে। অনেকে বলবেন দু'টো মানুষের এরকম পতঙ্গের মতো ছবি তুলবার সার্থকতা কি ? পরিচালক বলবেন, "আমি ঠিক তাই দেখাতে চেয়েছি,—নির্ম্মম স্বৈরতন্ত্রের কবলে এরা আজ কীট পতঙ্গের মতো ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে।" ব্যাপারটাতে হাসির কিছু নেই, ভাববার আছে অনেক কিছু।

যাই হোক্, চলচ্চিত্রের টেক্‌নিক্-এর এই আলোচনা এখানে কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়। নূতন কবিরা Symbol বা রূপকের সাহায্যে চলচ্চিত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী যে-কাব্য সৃষ্টি করেন তাকে বলে 'রূপক' কাব্য। সেখানেও ফাঁক থাকে, এবং চলচ্চিত্রের দর্শকের মতো সে-ফাঁক পাঠককে ভরাট কোরে নিতে হয়। বহির্জ্জগতের উপর কবি দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন চলচ্চিত্রের Camera Angle-এর মতো এবং বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার উপর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর করে। তারপর উপরে সিনেমার যে টয়-ট্রেনের কথা উল্লেখ করেছি, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সে রকম বহু অর্থহীন শব্দ বা বর্ণনা রূপক কবিদের কাব্যে থাকে, কোনোটা শুধু ধ্বনির জন্যে, কোনোটা ভাবানুষঙ্গের জন্যে, কিন্তু কবিরা বলেন যে সমগ্র কবিতাটির অনবচ্ছেদ গতি রক্ষা করা হয় এই সব সংযোজনার দ্বারা। অন্তরের বেপথু আবেগ বা ক্রমবিলীন সংবেদন মসৃণ বা নির্ম্মম শব্দের আভরণে কাব্যে প্রকাশিত হয়। কোথাও থাকে শুধু সুরের আবর্ত্ত, ধ্বনির তরঙ্গ, অন্তর্চ্ছন্দের প্রবাহ, আবার কোথাও থাকে মৃত্যুমলিন ইতিহাস-জীর্ণ কাহিনীর সঙ্গে দুর্ব্বোধ্য পাণ্ডিত্য। সকলের মিলনের জন্যে ঘটকগিরি (এলিয়ট্-এর ভাষায় Catalytic Agent) করেন

কবি, এবং সেই অপূর্ব্ব মিলনে হয় কাব্য সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত দিলে এই কাব্যের স্বরূপ বোঝা আরও সহজ হবে।

ইংরেজীতে এই নূতন রূপক কাব্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোচ্ছেন টি. এস্. এলিয়ট্। এলিয়ট্-এর কাব্য প্রধানত সঙ্গীত-ধর্ম্মী। নানারকম কাব্যিক ও অকাব্যিক শব্দের দ্বারা তিনি বিভিন্ন আলোকপাত কোরে তাঁর আবেগ বা সংবেদন প্রকাশ করেন। তাছাড়া মৃত্যুর সুরও তাঁর কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর পাণ্ডিত্যের কঠিন স্পর্শেও তাঁর কাব্য ভীষণ দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে, এবং আমাদের মতো সহৃদয় পাঠকও সেখানে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে টলতে টলতে ফিরে আসেন। এলিয়ট্-এর বিশ্ববিখ্যাত কবিতা The Waste Land-এর মধ্যে এই গুণগুলির সুন্দর কাব্যিক সমন্বয় দেখা যায়। ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এর ভাব হোচ্ছে এলিয়ট্-এর অধিকাংশ কবিতার যা ভাব তাই, যৌন অক্ষমতা বা প্রেমের বিফলতার সঙ্গে আত্মিক পরাজয় ও অবনতির সম্বন্ধ। এই ভাবকেই তিনি খেয়াল গায়কের মতো সুর, তান, বাট কোরে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে-রোমান্টিক কাহিনী ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এর উৎস তা তামুজ (Tammuz), ওসিরিস্ (Osiris) ও এ্যাডোনিস্-এর (Adonis) উর্ব্বরতার আখ্যায়িকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কাহিনীটি হোচ্ছে Fisher King-এর পৌরুষ-হীনতা দূরীকরণের কাহিনী। কেমনভাবে তিনি তাঁর শক্তি ফিরে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মরুরাজ্য শস্যশ্যামল হোলো। 'Lance' ও 'Grail' সন্ধানে 'Chapel Perilous'-এ যাত্রা করলেন Pure Knight রাজার রোগমুক্তির জন্যে এবং 'Lance' ও 'Grail' হোচ্ছে 'Phallic Symbols' বা লিঙ্গ-প্রতীক, অর্থাৎ জীবনের প্রতীক। তারপর Tiresias-এর কাহিনীতে কবিতাটিকে আরও দুর্ব্বোধ্য করা হয়েছে। টিরেসিয়াস্ নারী-পুরুষ দুইই, ভূত-ভবিষ্যৎ তাঁর অবিদিত নয়, তিনি হোমারের গানও জানেন এবং আগামী তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসও জানেন, যেমন এলিয়ট্-এর মতো আধুনিক পণ্ডিতেরা ফ্রয়েড্, ফ্রেজার, দাঁতে, ঋক্-বেদ ও বৌদ্ধ অগ্নিমন্ত্র সবকিছুই জানেন। এ-ছাড়া Tarot Pack হোচ্ছে এক গোছা তাশ, যা জিপ্সিরা আজও ভাগ্যগণনার জন্যে ব্যবহার কোরে থাকে, এবং যার দ্বারা প্রাচীন

মিশরীয় ক্যালেণ্ডারে নাইল নদীর জোয়ার-ভাঁটা নির্দ্ধারিত হোত। ট্যারট্ প্যাক্-এর 'Cup', 'Lance', 'Sword', Dish', সব ক'টিই Fertility Symbols বা উর্ব্বরতার প্রতীক।

> Madame Sosostris, famous clairvoyante,
> Had a bad cold, nevertheless
> Is known to be the wisest woman in Europe,
> With a wicked *pack of cards.*

> I do not find
> The *Hanged Man.* Fear death by water.
> I see crowds of people, walking round in a ring.

(*Italics* আমার)

এখানে 'Hanged Man' হোচ্ছে 'Hanged God', যাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল জীবনের প্রাচুর্য্যের জন্যে। তারপর Tiresias—

> I Tiresias, though blind, throbbing between two lives
> Old man with wrinkled female breasts,...

> I Tiresias, old man with wrinkled dugs
> Perceived the scene, and foretold the rest—
> I too awaited the expected guest.

> And I Tiresias have foresuffered all
> Enacted on this same divan or bed ;
> I who have sat by Thebes below the wall
> And walked among the lowest of the dead.

এই সব প্রাক্তন প্রতীকের সাহায্যে এলিয়ট্ ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এর দৃশ্য নির্ব্বাচন করেছেন কখন এলিজাবেথীয় রাজদরবারে, কখন সমরোত্তর লণ্ডনে। কখন তাঁর কবিতার মধ্যে শোনা যায় বস্তির অধিবাসীদের বীভৎস প্রেমের জঘন্য আলাপ, কখন শীর্ণ টাইপিষ্টের একঘেয়ে শব্দ, কখন বা কোনো অভিজাত ড্রয়িংরুমে কোনো ভদ্রমহিলার হিষ্টিরিয়ার গোঙানি। তার মধ্যে ফিনিশিয়ার ও স্মির্ণার স্মৃতি আছে, দাঁতের নরক এবং আধুনিক প্রেমালাপ আছে। এই সব বিরোধী বিষয়ের হাল্কা ও গম্ভীর দৃশ্যের সংস্থানের মধ্য

থেকে অর্কেষ্ট্রার মতো আমাদের কানে পৌঁছয় নৈরাশ্য, অসীম শূন্যতা ও সর্ব্বগ্রাসী ব্যর্থতার সুর। এ যেন ট্রয়ের প্রাচীর গঠন এবং এথেন্স-এর প্রাচীর ধ্বংসের সঙ্গীত—"The incoherence, the shabbiness, the emptiness, of a loveless infertile world."

ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এর মধ্যেই এলিয়ট্ প্রণতি জানালেন বুদ্ধদেবের ত্যাগমন্ত্রের কাছে, লোভ হিংসা পরিবর্জ্জনের মধ্যে তিনি শান্তির বাণী শোনালেন, এবং সেই বাণী পরে এলিয়ট্-এর কাব্যে আমরা গির্জ্জার ধর্ম্মযাজকের প্রার্থনা-পাঠের মতো শুনলাম।

> O Father we welcome your words,
> And we will take heart for the future,
> Remembering the past.
>
> The heathen are come into thine inheritance,
> And thy temple have they defiled.
>
> Our age is an age of moderate virtue
> And of moderate vice
> When men will not lay down the Cross
> Because they will never assume it,
> Yet nothing is impossible, nothing,
> To men of faith and conviction.
> Let us therefore make perfect our will,
> O GOD, help us.

(Choruses from 'The Rock')

রূপক কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জেমস্ জয়স্-এর 'Work in Progress'-এর নাম করা উচিত। 'ওয়ার্ক ইন্ প্রোগ্রেস্' গদ্যকাব্য। দৃশ্যটি যদিও ডাব্লিন্-এর ফিনিক্স্ পার্কের একটি ট্যাভার্ন্, তাহোলেও কল্পনায় দৃশ্যটি যেখানে ইচ্ছা ভেবে নেওয়া যায়। নায়ক Humphrey Chimpden Earwicker সর্ব্বকালের পুরুষ, এবং তাঁর নামের প্রথমাক্ষর H. C. E.-এর অর্থ হোচ্ছে Here Comes Everybody. তাঁর স্ত্রী Anna Livia Plurabelle-ও সর্ব্বকালের নারী, এবং তাঁদের সন্তান Shem ও Shaun পৃথিবীর শিশু, স্বপ্নও তাদের আদিম মানব-জাতির কাহিনী। অবচেতন মনের

সায়াহ্নালোকে এই কাব্যের রূপ নাকি 'উর্ব্বশীর' মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শব্দ শুধু সুরের আদেশ মেনে চলে, অর্থের নয়। যেমন '*Bluddlefilth*' শব্দের অভিধানে অর্থ নেই, কিন্তু ওটা 'Blood', 'Bludgeon', 'Filth' ও 'Battlefield' শব্দগুলির কাটা-ছাঁটা উগ্ররূপ। যেমন '*Thonthorstrok*' শব্দটি 'Lightning Stroke', 'Thunder'-এর ভাব বহন করে। পাঠকের ধাতস্থ হবার অবসর থাকবে না, কারণ দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে জয়স্ দ্রুতগতি ফিলম্-অপরাটেরকেও হার মানিয়েছেন, এবং শুধু ভাব বা ঘটনা নয়, সময়ের উপরেও তিনি দুরবিন বসিয়েছেন, অতীত-বর্ত্তমান, স্বপ্ন-বাস্তব একই ঘরের মধ্যে এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে অনর্গল আর এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে। ঘটনাগুলিও স্বপ্নের মতো মসৃণ, পিচ্ছিল, আর তার মধ্যে শব্দের বা ভাষার নহবত্, অর্কেষ্ট্রা, ব্যাণ্ড্ বা ব্যাগ্‌পাইপ্ বাদ্য যা ইচ্ছা বলা যেতে পারে। যেমন নদীর ধারে ধোপানীদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় যে ঘনায়মান অন্ধকারে নদী পাথরের নুড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বয়ে চলেছে ধীরে এল্‌ম গাছের তলা দিয়ে :

> Flittering bats, fieldmice balk talk. Ho! Are you not gone ahome? What Tom Malone? Can't hear with hawk of bats, all the liffeying waters of. Ho,talk save us! My foos won't moos. I feel as old as yonder elm. A tale told of Shaun or Shem? All Livia's daughtersons. Dark hawk hears us. Night! Night! My ho head halls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of John or Shaun? Who were Shem or Shaun the living sons and daughters of? Night now! Tell me, tell me, elm! Night. night. Telmetale of stem or stone. Beside the rivering waters of, hitherandthithering waters of. Night!

জিয়ান্‌বাতিস্তা ভিকো, এ-যুগে ওজ্‌ওয়াল্ড্ স্পেংলার যাঁর শিষ্য, জেমস্ জয়স্ তাঁরই দর্শনে অনুপ্রাণিত। সপ্তদশ শতাব্দীর এই ইতালীয় জুরিষ্ট ভিকোর দর্শনের মর্ম্মকথা হোচ্ছে—ইতিহাসের প্রগতি নেই, এবং জাতির বিকাশের তিনটি স্তর আছে—Divine, Heroic ও Human. প্রথম স্তরে অর্থাৎ আদিম যুগে গবর্ণমেণ্ট হোচ্ছে স্বৈরাচারী, দ্বিতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক।

গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের ফল স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার আবির্ভাব হয় এবং পুনরায় বর্ব্বরতার যুগ ফিরে আসে। এইভাবে ইতিহাস চক্রবৎ ঘুরতে থাকে। জয়স্-এর সাহিত্য এই দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'Work in Progress'-এর মধ্যে এই দর্শনের সুরই ধ্বনিত হয়। এজ্‌রা পাউণ্ড্-এর 'Cantos'-ও একই দর্শনাশ্রয়ী, সেখানেও দেশ-কাল সব ইতিহাস-অতীত, মানুষ বুদ্‌বুদের মতো। মানুষের মনে ইতিহাসের নিয়ম অনুসন্ধান কোরে এবং শব্দকে যাদুধর্ম্মী কোরে এঁরা ভিকো-স্পেংলারের দর্শনকেই রূপায়িত করেছেন, এবং এ-যুগের মানুষের সামনে বর্ব্বরতা বা আদিমতার পর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। অবচেতনার অন্ধকারে তাই এঁদের রূপকারী লীলাখেলা, এবং নিস্তরঙ্গ ইতিহাস ও কালের বুকে এঁদের মানবমানবীরা সব মোমের পুতুল।

Symbolist বা 'রূপক' কাব্য ছাড়াও কাব্যের আর একটি আঙ্গিক প্রচলিত হয়েছে, তাকে Imagist-কাব্য বা 'চিত্রকাব্য' বলা হয়। Imagism-কে কেউ বলেন 'Inverted Symbolism', কেউ বলেন Imagist-রা হোচ্ছে 'advocates of nudism in poetry'. এজ্‌রা পাউণ্ড্ হোলেন এই প্রত্যক্ষ চিত্রধর্ম্মী কাব্যের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা। বাহ্যিক বা আত্মিক বিষয়কে প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখতে হবে, এবং শব্দের বাহুল্য একেবারে বর্জ্জন করতে হবে। ছন্দ শব্দ গুণে বা মাত্রা গুণে চলবে না, শুধু গানের সুরের মতো শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। রূপক কবিদের মতো দ্রুতসঞ্চরণশীল প্রতিরূপ-সমষ্টির স্পর্শে ইমেজিষ্ট্ কবিরা তাঁদের অনুভূতি অপরের মনে জাগ্রত করেন না, প্রত্যক্ষ জগতের বা বিষয়ের প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিরূপ বা অনুভূতির সৃষ্টি করেন। Imagism-কে সেইজন্যই 'Inverted Symbolism' বলা হয়ে থাকে। এজ্‌রা পাউণ্ড ছাড়াও, এমি লাউয়েল্, এইচ্. ডি (H. D) প্রমুখ অনেক কবি এই চিত্রধর্ম্মী কাব্যের অনুরাগী। পাউণ্ড্-এর 'Cantos' কবিতার খানিকটা বর্ণনা পড়লেই এই কাব্যের রূপ বোঝা যাবে :

> **God-sleight then, god-sleight :**
> **Ship stuck fast in sea-swirl,**
> **Ivy upon the oars, King Pentheus,**
> **grapes with no seed but sea-foam,**

Ivy in scupper-hole.
Aye, I, Acoetes, stood there,
    and the god stood by me,
Water cutting under the keel,
Sea-break from stern forrards,
    wake running off from the bow

And where was gunwale, there now was vine-trunk,
And tenthril where cordage had been,
    grape-leaves on the row-locks,
Heavy vine on the oar-shafts,
And, out of nothing, a breathing,
    hot breath on my ankles,
Beasts like shadows in glass,
    a furred tail upon nothingness.
Lynx-purr, and heathery smell of beasts,
    where tar smell had been,
Sniff and pad-foot of beasts,
    fur brushing my knee-skin,
Rustle of airy sheaths,
    dry forms in the *aether*.
And the ship like a keel in ship-yard,
    slung like an ox in smith's sling,
Ribs stuck fast in the ways,
    grape-cluster over pin-rack
    void air taking pelt.

সমসাময়িক কবিরা কোকিল বা নাইট্ইংগেলের গান শুনতে হয়তো পান, কিন্তু সে-গানকে ছাপিয়ে ওঠে ট্র্যাফিকের শব্দ, যন্ত্রের ঘর্ঘরানি, কামান আর বোমা-বিস্ফোরণের আওয়াজ। তাই তাঁদের কাব্যের উপমাও সব এই যন্ত্রযুগের, এই সমরক্লান্ত পৃথিবীর। নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশটিতে তাই তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দই ধ্বনিত হয়:

This piston's infinite recurrence is
night morning night and morning night and
death and birth and death and birth and this
crank climbs (blind sisyphus) and see

steel teeth greet
bow deliberate
delicately lace
in lethal kiss—

ল্যুই আরাগোঁর 'রেড্ ফ্রন্ট্' কবিতাতে লাল ট্রেনের চলার হিস্-হাস্ শব্দ শোনা যায়—

The Red train starts and nothing shall stop it
U R
S S
U R
S S
U R
S S

—এলিয়ট্ মুক্তি সন্ধানে গির্জ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সেখান থেকে শোনালেন শান্তিপাঠ, মৃত্যুর শান্তি অথবা ধর্ম্মের পুনর্জীবন। পাউণ্ড্ মানুষকে দেখলেন ইতিহাস-অতীত, দেশ-কাল-অতীত বুদ্‌বুদের মতো, এ-পৃথিবী শুধু যার আবির্ভাব আর অন্তর্ধানের পুনরাবৃত্তি রচনা করে। জয়স্ অবচেতনার গোধূলি অন্ধকারে শুনলেন স্পেংলারের চক্রাবর্ত্তন—বর্ব্বরতা আর সভ্যতা, সভ্যতা আর বর্ব্বরতার যান্ত্রিক গতি, তাই গোধূলি অন্ধকার থেকে অতল অন্ধকারেই তিনি তলিয়ে গেলেন, থৈ পেলাম না আমরা। এঁদের সকলের মুখ থেকে শুনলাম এ-পৃথিবী, এ-সভ্যতা ব্যাধিগ্রস্ত, মানুষের শান্তি নেই, অতএব মুক্তি নেই, ব্যাধি নিরাকরণেরও উপায় নেই। কেবল ব্যক্তিগত সংবেদন আর অনুভূতির সঞ্চয় নিয়ে অবচেতন মনের গোলকধাঁধায় ঘোরো, প্রয়োজন হোলে গির্জ্জায় ফিরে গিয়ে ধর্ম্মের আশ্বাসবাণী শোনাও, প্রাক্তনের গৌরবে গৌরবান্বিত হও, আর তা না হোলে পথের উন্মাদের মতো ফুৎকারে সব মূল্যহীন বোলে উড়িয়ে দাও। এ-বাণী মানুষে শুনলো না, শুনবেও না, কারণ এ ইতিহাসের বাণী নয়, সভ্যতারও নয়। এই শ্রেণীর শিল্পীরা বলবেন, শিল্পীকে কবেই বা মানুষে বুঝেছে। কিন্তু এ-আত্মাভিমান আজ অচল।

সমরোত্তর ইংরেজী কাব্য

গতিশীল ইতিহাস মানব-সভ্যতার পথের উপর দিয়ে যে-বাণী শুনিয়ে যায় সে-বাণী যুগের মানুষের কানে পৌঁছবেই। সে-বাণী যুগান্তকারী যাঁরা তাঁরাই শোনেন, তারই প্রতিধ্বনি করেন সকল মানুষের কাছে, এবং মানুষও তা শোনে, অবশ্য যে বৃহত্তম মানবশ্রেণীর আয়ত্তে থাকে চলমান, ধাবমান ইতিহাস। চাকার তলায় যারা পড়ে তারা হয়তো শোনে প্রলাপ, কারণ গুঁড়িয়ে যারা যাবে তারা ভুল শুনলে, বা অর্থপূর্ণকে অর্থহীন মনে করলে ইতিহাসের ক্ষতি নেই। ইতিহাসের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও থাকে না। সে তার নিজের নিয়মে ধূলার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে, শোণিতের সাগর পাড়ি দিয়ে, অট্টহাসি-বিদ্রূপ-আর্তনাদকে নিস্তব্ধ কোরে শুধু দুলে দুলে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়, থামে না, পিছনে তাকিয়ে ছাখে না, অনবরত চলে আর চলে।

সেসিল্ ডে-লুইস্ ও স্টিফেন্ স্পেণ্ডার-এর কাব্যে ইতিহাসের সেই সুর শোনা যায়। এঁরা শেলীর মতো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। যন্ত্রযুগের উপাদান এঁদের কাব্যের আভরণ, উপমা ও বক্রোক্তির খোরাক জোগায়, কিন্তু এঁদের ছন্দের শিঞ্জনের মাধুর্য্যও মুগ্ধ করে। অডেন্ সাম্যবাদী সমাজের জন্যে তত কাতর নন, যত উদ্‌গ্রীব তিনি ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে। ভবিষ্যতের দিকে যখন তিনি চোখ তুলে চান তখনো সেখানে শুধু নিজের মধ্যবিত্তশ্রেণীর উভয়সঙ্কটের কথা চিন্তা করেন, এবং তাদের হাস্যকর কার্য্যকলাপ দেখে বিরক্ত হন। অডেন্-এর কাব্যে তাই গুপ্তচর, বিমান চালক, কামান, ভগ্ন গৃহ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িকদের ধমক দিয়ে তিনি বলেন—

> Shut up talking, charming in the best suits to be had
> in town
> Lecturing on navigation while the ship is going down.
> Drop those priggish ways for ever, stop behaving like a
> stone :
> Throw the bath-chairs right away, and learn to leave
> ourselves alone.
> If we really want to live, we'd better start at once to try ;
> If we do'nt, it does'nt matter, but we'd better start to die.

অডেন্-এর 'Dance of Death'-এর Announcer-এঁর মুখ দিয়ে তাঁর নিজের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বক্তৃতা হোচ্ছে :

> We present to you this evening a picture of the decline of a class, of how its members dream of a new life, but secretly desire the old, for there is death inside them. We show you that death as a dancer.

পর্দ্দার অন্তরাল থেকে কোরাস্-এর শব্দ শোনা যাবে : Our Death. অডেন্ 'Old Gang'-কে আক্রমণ করেন, সমাজের যে-শ্রেণী ধ্বংসের প্রতীক তাকে বিদ্রূপ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিরুদ্ধেও সেই আক্রমণ ও বিদ্রূপ নিক্ষেপ করেন। নিজেকে তিনি নিজেই বিদ্রূপ করেন—কখন হেসে, কখন রেগে—buffoon-এর মতো। *

স্পেণ্ডার রোমাণ্টিক কবি। তাঁর দৃষ্টিও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত, শেলীর মতো। তাঁর কবিতাও তাই নূপুর বাজিয়ে যায় আশার, আকাঙ্খার, উদ্দীপনার, বৃহত্তম মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে একত্রে সে জয়যাত্রায় বেরোয়। এ-পৃথিবীকে যারা অভিশপ্ত করেছে, অভাবে আর অনাহারে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবার আদেশ দিয়েছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে তিনি শুধু বিদ্রোহ কোরেই ক্ষান্ত হন না, অভিশপ্তদের আহ্বান কোরে বলেন—

> Oh Comrades, step beautifully from the solid wall
> advance to rebuild and sleep with friend on hill
> advance to rebel and remember what you have
> no ghost ever had, immured in his hall.

শেলীর মতো স্পেণ্ডারও কল্পনাকে জীবন্ত কোরে তুলতে পারেন, যে-কল্পনা অসম্ভব নয়, অলীক নয়, বাস্তবতর, বৃহত্তর সত্য। স্পেণ্ডারের

---

* অডেন্-এর এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা উচিত, কারণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে যাঁরা পরস্পর পরস্পরকে 'বিপ্লবী' বোলে প্রচার করেন, তাঁদের সঙ্গে অডেন্-এর সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে অডেন্ ইংল্যণ্ড পরিত্যাগ কোরে পলায়ন করেছেন। অবশ্য জন্ স্ট্রেচির ডিগ্‌বাজীর তুলনায় এটা অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা।

স্বপ্ন বা কল্পনার উৎস যে বাস্তব জগৎ, তাঁর নিজেরই পরিপার্শ্ব, সমাজ ও সভ্যতা, তা তাঁর কাব্যের উপমা-নির্ব্বাচন থেকেই বোঝা যায়। তিনি রাস্তার মোড়ে চলন্ত যানবাহন বা বেকারের ভিড়ও ছাখেন, যুদ্ধের সাজসজ্জা ছাখেন, বিগত মহাযুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতির সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি তাঁর মনে ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেক করে, কিন্তু তবু তিনি তাঁর সহকর্মীদের বলতে ভোলেন না:

> Drink from here energy and only energy
> As from the electric charge of a battery

স্পেণ্ডার-এর সঙ্গে ডে-লুইস্-এর সাদৃশ্যও খুব বেশী। ডেলুইস্ও বিশ্বাস করেন যে

> Men shall be glad of company, love shall be more than a guest ;
> And the bond no more of paper.

এর সঙ্গে এলিয়ট্-এর আলফ্রেড্ প্রুফ্রক্-এর ঘিন্‌ঘিনে নৈরাশ্য, "I have measured my life with coffee spoons..." তুলনা করলে মনে হয় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কলরোলের পাশে সত্যই নেড়ীকুকুরের অস্পষ্ট নাকীকান্না শুন্‌ছি—The world ends not with a bang, but a whimper. এ-কান্না শুনে করুণা করা ছাড়া উপায় কি? কারণ আজ চারিদিকে রেক্স্ ওয়ার্ণার-এর Hymn-এর প্রতিধ্বনি—

> ...this is the spring of blood
> Heart's heyday, movement of masses, beginning of good.

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

'আধুনিক' কথার কাল-নির্ণয় বা কবি-নির্ব্বাচন নিয়ে যাতে অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি না হয় সেইজন্য আমি 'সাম্প্রতিক' শব্দটি প্রয়োগ করলাম। কিন্তু 'সাম্প্রতিক' শব্দটিরও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সাহিত্য-বিচারে কাল ভাগ করার দায়িত্ব অনেক, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি প্রত্যক্ষ সামাজিক জীবন যে-ভাবে, যে-গতিতে আবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, সেভাবে সাহিত্যের আবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন হয় না। সমাজের সঙ্গে শিল্পীর বা কবির যান্ত্রিক যোগাযোগ নেই, এবং যাঁরা সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে এইরকম যান্ত্রিক সম্বন্ধ প্রচার করেন তাঁদের সেই সাহিত্য-বিচার যে-কোনো সমালোচনার মানদণ্ডে উত্‌রে যেতে পারে, কিন্তু মার্কসীয় রীতিতে সেটা ভুলই প্রতিপন্ন হবে। এ-কথা মার্কস্‌-আতঙ্ক-কাতর রুগীদেরও যেমন জানা উচিত তেমনি অতি-কৌতূহলী মার্কসীয় সমালোচকেরও সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সমাজের পরিবর্ত্তনশীল শক্তিগুলি সামাজিক মানুষ হিসাবে শিল্পী বা কবির মনে আবর্ত্তের সৃষ্টি করবে কিন্তু তার প্রকাশ একেবারে বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে হবে না, যেমন হবে বাস্তব রাজনীতির বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে। হবে না তার কারণ শিল্পী-মনের ধর্ম্ম ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার মতো নয়, এবং শিল্প ফটোগ্রাফ্‌ নয়। শিল্পীর চেতনা ও অভিজ্ঞতার এমনই গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য যে প্রায় সময়ই তিনি ভবিষ্যতের রূপ সত্যের মতো উপলব্ধি করেন, আবার কখন ঘাতপ্রতিঘাতে কুয়াশার জালে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধমান শক্তিগুলির পিছনে থাকেন। এই হোচ্ছে শিল্পীর মন। সুতরাং সমাজ-সচেতন ও সমাজ-অচেতন বোলে শিল্পীদের শ্রেণী-বিভক্ত করা একরকম ভুলই বলা চলে। সমাজ-অচেতন বোলে যে, শিল্পী নীরব শিল্প-সাধনায় মনোনিবেশ করেন বা নিরালম্ব কাব্যমার্গে কল্পনার পক্ষ বিস্তার করেন, তা নয়। সমাজ-সচেতন বোলেই পলায়নের, বিদ্রূপের, বিদ্রোহের বা বিপ্লবের মনোভাব তাঁর মধ্যে উদ্রিক্ত হয়। সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রতিকূলতা, বা তার যে-কোনো রূপ

কবির মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাতে তিনি হয় তার উপর বিমুখ হন, না হয় সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পান আনন্দের ও আনন্দ-প্রকাশের। সেইজন্য স্থিরভাবে বিচার কোরে দেখতে গেলে কোনো কবি বা শিল্পীকে সমাজ-অচেতন বলা যায় না, বলা যায় যে সমাজের প্রতিবেশ তাঁর মনে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় আবেগ বা অনুভূতির সৃষ্টি করেছে, এবং তার মূলে রয়েছে তাঁর মনের সঙ্গে বহির্জগতের অর্থাৎ তাঁর পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশেই শিল্প, যেমন কবিতা, চিত্রকলা ইত্যাদি। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন সমাজ-অচেতন নন, তেমনি নজরুল ইস্‌লামও নন। যে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, শান্ত সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের মলিন অবশিষ্ট ত্যাগ-সাধনার ও নূতন প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পুষ্ট, তাতে 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা' 'পূরবী' 'মহুয়া' এবং 'শেষের কবিতার' উপন্যাস-গদ্যকবিতা সবই অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তেমনি যৌবনের উন্মত্ততায়, দীর্ঘ বৎসর ব্যাপী পরাধীনতার কারাগারে বন্দী মনের স্বাধীনতার উদ্দাম বাণীর উদ্দীপনায়, সন্ত্রাসবাদের রামধনু রঙের অস্পষ্ট ঝলমলানি কাজি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার দামাল ভঙ্গিমার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। সুতরাং সমাজ-সচেতন বা অচেতন এইভাবে শিল্পীদের শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। একমাত্র সময়ের দিক থেকে করা যেতে পারে। কিন্তু সময়ের দিক থেকে করলেও সেখানে অনেক বিবেচনা করবার আছে। কারণ নূতন সময়ে বা নূতন পরিপার্শ্বের মধ্যে নূতন কবি নূতন ভাবে আত্ম-প্রকাশ করলেও তাঁর সেই নূতনত্ব প্রাক্তনকে স্বীকার কোরে এবং ন্যায্য মূল্য দিয়েই গৌরবান্বিত হয়। পুরাতন থেকেই নূতনের উৎপত্তি, কারণ নূতনত্ব আর 'অদ্ভুতত্ব' এক নয়। তাই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আলোচনায় রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী কবিদের, অর্থাৎ মোহিতলাল মজুমদার, যতীন সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির যোগ্য স্থান পাওয়া উচিত হোলেও এখানে তাঁদের উল্লেখ করা হয়নি, কারণ শুধু যে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী সময়ই এ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়, ১৯৩০-'৩২ সালের যে বিরাট জাতীয় আন্দোলনে সর্ব্বপ্রথম জনগণের সুপ্ত শক্তির আভাষ পাওয়া যায় এবং যে প্রবল অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে এ-দেশের সমাজের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন শ্রেণী বিপর্য্যস্ত

ও বিভ্রান্ত হয়, তাদের বিশাল ব্যর্থতা ও হতাশার আওতায় যাঁরা লালিত হয়েছেন এখানে শুধু সেই সব কবির নামই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং যেহেতু প্রত্যেক নূতন যুগান্তরী সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্র বহুজনের কলরবে সরগরম হয়ে ওঠে, যাঁদের অনেকেই শ্যাওলা ও পরগাছার মতো বাড়তে থাকেন, সেইজন্য এখানেও সেই সব পরগাছা-কবিদল আসন পাননি। এই কথা বোলে আমি এখানে অন্তত একটি সত্য নিঃসংশয় চিত্তে স্বীকার করলাম যে আজকের সাহিত্য-আন্দোলন যুগান্তরী আন্দোলন, বিশেষ কোরে কাব্যের ক্ষেত্রে।

বিশেষ কোরে কাব্যের ক্ষেত্রে কেন এ-প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে জাগবে। তাহোলে এই আন্দোলন যাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে হয়। যে-দেশের মুষ্টিমেয় লোক নাম সই করতে জানে এবং যেখানে গণশিক্ষা আজও কল্পনার রাজ্যে, সেখানে শিক্ষা বা শিল্পের সাধনা যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এ অত্যন্ত সহজ সত্য কথা। এ শুধু এ-দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে আদর্শহীনতা। কোনো বিশেষ আদর্শের অনুসরণ কোরে এরা জীবনের পথে অগ্রসর হয় না, ব্যক্তিগত সুবিধাই হোচ্ছে এদের জীবনের গতি-প্রকৃতির একমাত্র নিরূপক। বাংলাদেশে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, যে-ধারা বিশিষ্ট প্রতিবেশের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশকে কেন্দ্র কোরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রায় ভারতবর্ষ ব্যাপী ইংরেজরা রাজ্য বিস্তার করল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙালী মধ্যবিত্তদেরও বিস্তার ঘটল। ইংরেজের স্কুল, পুলিস, দপ্তর দোকান, তহশীল, ডাকঘর সর্ব্বত্রই এঁরা দু'পাতা ইংরেজী আয়ত্ত কোরে দখল কোরে বসলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলার কৃষকদের ডাক পড়ল না, শ্রমিক হবার জন্যে উত্তর ভারতের দীন দরিদ্র দৈহিক শ্রমজীবিদের ডাক পড়ল। সেখান থেকে দলে দলে মজুর চাকর দারোয়ান বণিক এল,—বিহারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া আর মাড়োয়ারী নগরে এসে জুড়ে বসল। এইভাবে বাংলাদেশের নির্লজ্জ মধ্যবিত্তশ্রেণী শুধু যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অম্লান বদনে সাম্রাজ্য বিস্তারে

সহায়তা করলেন তা নয়, তাদের পিছু পিছু দেশী কুকুরের মতো ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে, গরীব থেকে হঠাৎ-বড়মানুষ হয়ে হোলেন রায় সাহেব, ছোট সাহেব। বড়বাবুর তম্বিগম্বিতে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠলো; এবং বাংলার অসংখ্য কৃষকদের এতটুকুও ভাগ্যপরিবর্ত্তন তো ঘটলই না, উপরন্তু তারা মেদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদ-পালিত জমিদার-গোষ্ঠীর লৌহশৃঙ্খলে দিন দিন আরও নির্ম্মম ভাবে আবদ্ধ হোলো। বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী হোলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় জনসাধারণের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদে-শাসক সম্প্রদায়, এবং এই ময়ুরপুচ্ছধারীদের মনে যে 'হামবড়া' ভাবের বীজ উপ্ত হোলো পরে শুধু রাজনীতিতে নয়, আজকে সাহিত্যে পর্য্যন্ত তার বিকাশ হোলো বিকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে।

এই হোলো বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে ইংরেজের 'অমূল্য' দান, যার প্রগতিশীল দিকটা হোলো মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আলোকপাত। এর সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হোলো। সংস্কৃত পণ্ডিতের টোলে ও বিচার সভায়, কীর্ত্তন ও কবিগানের আসরে, বৈষ্ণব পদাবলীর ও শ্রীচৈতন্যের ভাবালুতায় যে-মন পরিপুষ্ট তা অত সহজেই ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করল না। সাহেবিয়ানার সঙ্গে বৈষ্ণবী ন্যাকামি ও ভাবালুতা সংমিশ্রিত হয়ে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী লক্ষণ দেখা গেল,—অহমিকা, বুদ্ধিচর্চ্চা বা যুক্তিপ্রিয়তা, স্বাধিকার-লাভেচ্ছা, ভাবপ্রবণতা ও চমকপ্রদতা। বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রথম প্রকাশ হোলো ১৯০৫ সালের আন্দোলনে। এই আন্দোলনে নয়া-স্বদেশী বা বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর দাবী হোলো—উৎপাদন-কর বন্ধ করা হোক; জমিদারদের দাবী হোলো জমিদারী-ব্যবস্থা সারা দেশব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক; আর মধ্যবিত্তশ্রেণীর দাবী হোলো—বিদেশীর শাসনকার্য্যে অংশীদার করা হোক, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসে তাদের নেবার সুবন্দোবস্ত করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রবণতা ও চমকপ্রদতা থেকে জন্ম হোলো বিপ্লব-আদর্শের, যে-আদর্শ পরে সুযোগমতো রূপান্তরিত হোলো সন্ত্রাসবাদের মধ্যে। ১৯০৫ সালের পর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের কঠিন অভিজ্ঞতা, আর্থিক ক্রম-অবনতি এবং

গান্ধীজীর অসহযোগ ও আইনঅমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতায় ক্রমে ক্রমে শুধু যে বিপ্লবাদর্শের নিঃসীম নিলীমায় মেঘ জমল তা নয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাস্তবক্ষেত্রেও ভাঙন ধরল। আর্থিক দুর্গতি ও সংকটের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ নিম্নে এসে প্রায় শ্রমজীবীশ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল, একটি অংশ আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে অতি-সচেতন হয়ে হোলো ত্রিশঙ্কু, এবং আর একটি অংশ বিদেশীর পদলেহন কার্য্যে আরও তৎপরতার সহিত মনোনিবেশ করল, উন্নততর স্তরে উন্নীত হবার জন্যে। ওদিকে বাইরের পৃথিবীতেও ভীষণ পরীক্ষা চলেছে,—একদিকে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে অর্থাৎ সোভিয়েট্ রুশিয়াতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক সংকল্প অপ্রত্যাশিত সাফল্যে শেষ হয়ে আসছে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের জয় ঘোষণা কোরে, আর একদিকে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীরই কাপুরুষতা, চিত্ত-কৈবল্য ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ফ্যাশিষ্ট-বর্ব্বরতার অভ্যুদয় হয়েছে, আর সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রের শান্তির মুখোস পরে চলেছে নির্বিবচারে শোষণ, বর্ব্বরতা-তোষণ ও সমরপ্রস্তুতি। ভের্সাই-য়ের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের প্রেতাত্মা ও ক্লিষ্ট আত্মা চারিদিকে অট্টহাসির কলরব তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিক থেকে সাম্যবাদের সহজ স্ফূর্ত্তি, প্রাচুর্য্য, শান্তি ও সারল্যের হাসিতে পৃথিবী গুঞ্জরিত। এ-দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী তাই এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন হোলেন। গণ-আন্দোলনের ও গণশক্তির সাফল্যের সম্ভাবনা যাঁদের আশান্বিত করল এবং আর্থিক দুর্গতি যাঁদের সে-পথের প্রলোভন দেখালে, তাঁরাই মহা উল্লাসে গঠন করলেন নিখিল ভারত কিষান সভা এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। সেখানেও কিছুদিনের মধ্যে যখন গণজাগরণ সত্যই আরম্ভ হোলো এবং তার প্রকাশ হোলো ধর্ম্মঘটে, কৃষক বিদ্রোহে, তখন বিপ্লবের আসন্ন আতঙ্কে অনেকে সূচনাতেই কাতর হোলেন। ফলে গণ-আন্দোলনে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের একদল রিফর্মিষ্ট হোলেন, আর একদল রিভল্যুশানারী। বৃটিশ লেবর পার্টি ও ফরাসী সোশ্যালিষ্ট ও রেডিক্যাল পার্টির পথ ধরে' রিফর্মিষ্টরা অগ্রসর হোলেন, বিনা বিপ্লবে শান্তি ও সন্ধির দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রিয় ইউটোপিয়া প্রতিষ্ঠার জন্যে, এবং প্রকৃত বিপ্লবী যাঁরা তাঁরা প্রকাশ্যে দলগঠন কোরে কাজ করতে বাধা পেয়ে গোপনে

জনগণের মধ্যে, অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিলেন। যাঁরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রইলেন তাঁরা কটূক্তিতে পারদর্শীতা অর্জ্জন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোলেন এবং সামনে দেখতে লাগলেন ধূসর ধোঁয়া আর ব্যর্থতা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতির বিলাসিতা ভুলতে না পেরে, কোরান, গীতা আর মনুসংহিতা নিয়ে পরস্পর মুখখিস্তি অভ্যাস করা সুরু করলেন। আর একদল পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে বিদেশী ও দেশী ধনিক-গোষ্ঠীর বেতনভোগী 'দালাল' শ্রমিক ও কৃষক নেতা হোলেন। এঁরাই শ্রমিক ধর্ম্মঘট অবসানের সময় হঠাৎ-আবির্ভূত হয়ে 'রফার' জন্যে 'দরদী' ও 'জ্বালাময়ী' ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ ও ডালহৌসি-অভিমুখী বেলা দশটার যাত্রীদের কলম-পেশা করের তালি অর্জ্জন করেন। বাংলার মধ্য-বিত্তশ্রেণীর এই হোচ্ছে সমগ্র রূপ।

এ-রূপের এইভাবে পরিচয় দেওয়া এখানে প্রয়োজন ছিল, কারণ সাম্প্রতিক কাব্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁরাও এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোনো একটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত, এবং অনেকে কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না রেখে বিশুদ্ধ কাব্য চর্চ্চা করলেও, আদর্শ নিয়ে সকলেই চিন্তা করেছেন, প্রভাবিতও হয়েছেন। তা ছাড়া কার্ল মার্কস্ই স্বয়ং সাম্যবাদীর ইস্তাহারের মধ্যে স্বীকার কোরে গিয়েছেন যে আদর্শের দিক দিয়ে মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগামী, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী তাঁদের সহযোগিতা শ্রমজীবী-বিপ্লবের সময় দুর্লভ নয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ এইভাবে বিপ্লবে সহায়তা ও সহযোগিতা করে, এবং তার মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবীরা বা সাহিত্যিকরা একেবারে বাদ পড়েন না। বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কবিরা সাম্প্রতিক কাব্য সৃষ্টি করছেন, এবং যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াস উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যেও প্রকৃতি-ভেদ আছে। এই প্রকৃতি-ভেদ বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন, এ-ক্ষেত্রেও প্রায় ঠিক সেইরকম। এখন এই সাম্প্রতিক কাব্য ও কবি-মনের পরিচয় দেওয়া যাক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। সর্ব্বপ্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর নাম করতে হয় এইজন্য যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন-কাহিনী গল্প-সাহিত্যে বর্ণনা করা ছাড়াও, প্রেমেন্দ্র মিত্র কাব্যে এই 'শ্রেণীর'

সমগ্র মানসিক রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তিনি এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর খামখেয়াল বা মনোভাবকে কাব্যে রূপায়িত করেননি, প্রকৃত শিল্পীর মতো নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর তৎকালীন (১৯৩০-'৩২) মানসিক রূপের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করেছেন, এবং তাকেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর "প্রথমা" নামক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। তাঁর শিল্পীসুলভ গভীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন আজ থেকে আট-দশ বছর পূর্ব্বেই জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার, দেশের দুর্গতির এবং জনগণের বিপুল ঘুমন্ত শক্তির আভাষ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কবি-অন্তর থেকে যেমন একদিকে 'প্রথমা'র মধ্যে উৎসারিত হয়েছে বর্ষার করুণ বৃষ্টি-ঝরানির মতো বিলাপের সুর, তেমনি আর একদিকে তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে জনগণের সম্মিলিত দূর পদধ্বনিতে। কে কবে এই পৃথিবীকে সূর্য্যকে লক্ষ্য কোরে ছুড়ে' দিয়েছিল, আর সেই থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সূর্য্যের চারিদিকে এই পৃথিবী ঘুরছে,—'প্রথমা'-র এই বিলাপ রাগিণীটি কান পেতে শুনলে মনে হয় এ যেন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অন্তরের মর্ম্মোৎসারিত কথা। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতায় কাতর হয়ে যখন কবি বলেন, "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল ; সে মিথ্যায় মত্ত হ'য়ে সত্য তোর ভোল,"—তখন সেই মধ্যবিত্তেরই মনের আর একটি দিকের পরিচয় পাই, যে-মন বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে হতাশ হয়ে কল্পনার নীড়ে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করে। আবার এই কবিরই অন্তর থেকে এই মধ্যবিত্তেরই অন্তরের আর একটি সহানুভূতির সুর শুনতে পাই পীড়িত ও নিঃস্বদের জন্যে—

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই !
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
দুয়েরি বল্গা নাই !

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির ;

প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা !

(প্রথমা)

এই একই সুরে আবার তিনি বলেন,—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরেব,
—আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্ম্মের আর ঘর্ম্মের,
বিলাস-বিবশ মর্ম্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !
... ...
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই !

স্বপ্নে ও বাস্তবে, আশায় ও নিরাশায়, ব্যর্থতায় ও সফলতার সম্ভাবনায় দোদুল্যমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই প্রাণের ও মনের পরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর 'প্রথমা'র প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে মুক্তছন্দে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপ তিনি জানেন না, তিনি জানেন গভীর অনুভূতির সরল ও সুষ্ঠু প্রকাশ, তাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর রূপটিকে তিনি এমন পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তার কোনো একটি দিকও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে যায়নি। এইখানেই তাঁর সঙ্গে অন্যান্য কবির পার্থক্য। তিনি একটি 'সমগ্র শ্রেণীর' কবি এবং

শক্তিমান কবি। সরল অনুভূতিকে তিনি সরল বেগবান ছন্দে প্রকাশ করেছেন, এবং সে-ছন্দ মাত্রা বা অক্ষরে শৃঙ্খলিত না হয়ে শুধু ধ্বনি ও স্বরের তালে তালে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন

কূলহীন যত কালাপানি মথি
লোণা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রাণ লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হল ভাই—

অথবা

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়।

'প্রথমা'র পর সাত আট বছরের মধ্যে কতো পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছে এই পৃথিবীর উপর দিয়ে, এই দেশে। একদিকে যেমন দেশের জনগণ জাগ্রত হয়েছে ক্রমে, তেমনি আর একদিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণী একটির পর একটি ব্যর্থতায় জর্জ্জরিত হয়ে, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখেছে, বিকৃত বাস্তবের কদর্য্যতায় আকৃষ্ট হয়েছে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর মতো সরল কবি অভিমানে বিদ্রোহ কোরে যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মসচেতন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন, নিজেকে ঘোষণা করেছেন 'সম্রাট' বোলে, তেমনি বিরতি বা উদাসীনতা বা বিদ্রূপে স্বস্তি পাননি, তাঁর তাজা প্রাণের চাঞ্চল্য ও অস্বস্তিকে প্রকাশ করেছেন, এবং কখন স্বভাবসুলভ কাল্পনিক দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন অতীতের দিকে নয়,

আগামী কালের দিকে। পৃথিবীতে শান্তি নেই, প্রচণ্ড ধ্বংসের প্রস্তুতি চলেছে একদিকে এবং এ-দেশেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৃহত্তম অংশ বিশ্বাসঘাতকতা কোরে জনগণের বৈরিতা করেছে আর মৃত্যুর ও ধ্বংসের নাকীকান্না কেঁদেছে। অথচ মুক্তির, শান্তির ও সাম্যের আহ্বানও শোনা যায়। তাই 'প্রথমা'র কবির প্রাণের তরল রস ক্রমে গাঢ় হয়ে গম্ভীর অন্তর্ছন্দোময় ভাষায় 'সম্রাট'-এর মধ্যে ব্যক্ত হোলো ১৯৪০ সালে।

শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট!
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই ত আমাদের চুক্তি!

একচ্ছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেও না হটাতে;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।

(সম্রাট)

এখানে কবি নিজেকে 'সম্রাট' বোলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও সজাগ রয়েছে। তারপর—

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি;
অবিরাম অশ্বক্ষুর ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।
—কতদূর হ'তে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির-মৌন হিম্ রাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ?
ঘুম কই? (সম্রাট)

অথবা

নাই ফুল, শস্যের মঞ্জরী।
বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্‌গারিছে বিষ বাষ্প ;
—আজ শুধু বাতাসে বারুদ।
শতাব্দীর দ্বিতীয় প্রহর,
বিধাতার রোষ-বজ্রে কাঁপে থরথর ;—
এ কি যুগান্তর ?
দুঃস্বপ্ন-মথিত রাত্রি
আরো কতবার,
মানুষের ইতিহাস করি' অন্ধকার
এল, গেল চলে।
সূর্যোদয় ধন্য হবে বলে,'
অকাতরে কত রক্ত বৃথা হ'ল পাত ;
শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত
আজো কই দিলনা'ত দেখা !
—দেবে কি কখনো ?

(সম্রাট)

এখানে শুধু অস্থিরতা আর সেই অস্থিরতায় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন। কবিমনে এখানে শান্তি নেই, এবং সংশয় আছে। ভাব এখানে তাই সংহত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, গতি তার মন্থর ও জমাট। তারপর—

শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি কর কবি।
... .
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগ্‌বে, শস্য বহনের
আর বিতরণের
আর হায় লোভের সংগ্রাম।
... ...
মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,

পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবী কালের ইতিহাসে, মানবের কীর্তি-কাহিনীর তলায়
অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা থাকবে না কি?

(সম্রাট)

অথবা

সহসা পাখার শব্দে উর্দ্ধে তুলি আঁখি:
—সন্ধ্যার দিগন্ত পানে উড়ে চলে দুই শুভ্র পাখী।
—সাগর-কপোত বুঝি!
সাগর-কপোত নয়,
মৃত্যুঞ্জয়ী স্বপ্ন আর আশা,
অক্লান্ত পাখায় বহি তৃপ্তিহীন আকাশ-পিপাসা
তিমির রাত্রির পারে চলে।

(সম্রাট)

কিংবা

স্বপ্ন দেখি সে পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি!

(সম্রাট)

এখানে স্বপ্নময় প্রশ্ন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন আর প্রাণের শ্যামলিমার এবং শস্যের ও শান্তির প্রশস্তি। কোথাও তাই ভাষায় ধ্বনির তরঙ্গ উঠেছে, আবার কোথাও ভাষা শান্ত, ধীর। প্রেমেন্দ্র মিত্র সংশয়, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং 'বাস্তবতর' স্বপ্নের মধ্যে এখনো দুলছেন, বৃহত্তম সত্যটিকে তলিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তবু তাঁর নিজস্ব শ্রেণী-দৃষ্টিতে তিনি যা দেখেন তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি কোরে দেখেন, তার মধ্যে আন্তরিকতার ও একনিষ্ঠার পরিচয় থাকে, তাই তাঁর কাব্যও কোনো পণ্ডিতের ভাষ্যের ধার

ধারে না, আপনার সহজ সারল্যে আপনি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এ-যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্র সেইজন্যই একজন বরেণ্য বহুজনপ্রিয় কবি, এবং আমরাও তাঁকে অভিনন্দন জানাব।

সজনীকান্ত দাস। বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনায় সজনীকান্তের অতুলনীয় দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবিলতা, অবনতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সহ্য করতে না পেরে নির্ম্মম শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বিদ্রূপের মধ্যেও তিনি গভীর দরদ দিয়ে কখন কখন বাইরের জগতের দিকে চেয়ে দেখেন, এ-দেশের বুকের উপর দিয়ে যেখানে অহিংসার ছদ্মবেশে হিংসার প্রতিযোগিতা চলেছে, এবং সাম্প্রদায়িকতা, আত্মাভিমান, পদমর্য্যাদা, কলহ বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে যেখানে নূতন যুগবাণী প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় না।

> বৃথা ক্ষোভ কান পাতি শোন, শোন এ যুগের বাণী
> অতীত মহিমা স্মরি করিও না নিষ্ফল বিলাপ ;
> নিজেরে অক্ষম ভাবি কি ফল ললাটে কর হানি—
> যুগ যুগ সঞ্চিত যে এ তোমার এ আমার পাপ !
> যুগান্তরে দৈন্য ত্যাজি রাশিয়া উঠেছে মাথা তুলি,
> ক্ষালন করেছে পাপ লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলিদানে,
> ... ...
> তুমি আমি কারাগারে দেখিতেছি মৃত্যু-বিভীষিকা
> কে মুছিবে এ জাতির ললাটের কলঙ্কের লিখা !
>
> (বঙ্গরণভূমে)

'বঙ্গরণভূমে'-তে কবির অনুভূতির গভীরতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বোঝা যায় যে পরিপার্শ্বের অন্তঃস্থলে প্রবেশ কোরে উপরের হীন কদর্য্যতা তিনি এড়াতে পারেননি। তাই তাঁর তৎকালীন কাব্যে শুধু নির্ম্মম শ্লেষ আর বক্রোক্তিই প্রকাশ পেয়েছে, আর ছন্দ অক্ষরগুণে ছড়ার মতো প্রবাহিত হয়েছে। এতে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্রূপ বোধ হয় এইজন্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয় না, কারণ তার মধ্যে মাদকতা ও চমকপ্রদতা থাকে, অন্তরকে উদ্বেল করবার মতো উপকরণ থাকে না।

এদিক দিয়ে সজনীকান্ত দাস সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর "রাজহংস"-এর মধ্যে। 'রাজহংস'-ও ১৯৩২-১৯৩৫ সালের মধ্যে রচিত, এবং সেখানে কবির অনুভূতি যেমন গভীর ও নিবিড়, তার প্রকাশও তেমনি সহজ ও সরল, মুক্ত গদ্যধর্ম্মী ছন্দের মধ্যেও তার অনুরণন শোনা যায়, এবং অমিতাক্ষরের বেশও তার বিসদৃশ ঠেকে না। রাজহংস-এর কবি মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে কুণ্ঠিত, দেবতার বিরুদ্ধে তিনি মানুষের কবি সদম্ভে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, স্বার্থান্বেষী ধনিকগোষ্ঠীর এবং প্রাণঘাতী ধনিকসভ্যতাকে তিনি ঘৃণা করেন, এবং নিজের দৃষ্টিকে সাময়িক সংকীর্ণতা ও ব্যর্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দূরে মৃত্যুজয়ী প্রাণের স্বচ্ছ প্রকাশকে তিনি অভিনন্দন জানান। এই ধরণীর রাজহংস সেই অনন্ত জীবনের প্রতীক, অবিচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহের মতো সুন্দর পক্ষ বিস্তার কোরে নীল আকাশের কোল দিয়ে সে উড়ে চলেছে। গতিবন্যায় সে গতিশীল।

> ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক,
> উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে ;
> নিয়ে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
> ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে,
> ধরিতে পারে না তার, উর্দ্ধে তার বিরাট প্রয়াণ,
> উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
> চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
> কোটি কোটি গ্রহচন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
> লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।
>
> (রাজহংস)

মানবেতিহাসের মর্ম্মবাণীটি রাজহংস-এর কবি শুনেছেন, যে-বাণী মৃত্যুকে জয় কোরে, ব্যর্থতাকে জয় কোরে, কদর্য্যতাকে দূর কোরে, চিরদিন ধ্বনিত হয়েছে প্রাণের, আশার, সাফল্যের ও সৌন্দর্য্যের সুরের মধ্যে।

> সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দেখিয়াছি মানুষের চোখে
> লালসার পঙ্কিল ইঙ্গিত।

মানুষের যন্ত্ররূপ, মানুষেরে করিতে হনন—
সর্পরূপে পশুরূপে পরস্পর চলে হানাহানি।
প্রভুত্ব দাসত্বে হানে, কদর্য্যতা হানে সুন্দরেরে—
বাহিরে মোহন আবরণ।
... ...
দিকে দিকে থৈ থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তারই মাঝে জীবন অঙ্কুর—
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখোমুখি,
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।
... ...
দূর কর মোহ আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল
হাসুক শ্যামল কিশলয়।

(রাজহংস)

যে-কবির কানে এই প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়েছে, যে-কবি 'মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ' পরাজিত কোরে নিজের মঙ্গলময় বাণী মানুষকে শোনাতে চান, তিনি দেবতার আশীর্ব্বাদের জন্যে লালায়িত হবেন না, সেই অমর্ত্ত্যলোক-বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন, এ স্বাভাবিক।

কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী রূপে!
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব? এরি মাঝখানে,
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে,
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন—
মুহু মুর্হু গর্জ্জিল কামান,
বিষবাষ্প ছড়াল চৌদিকে—
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।

আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি?
কর না কি বজ্র আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল হুংকারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে।
...   ...
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
তোমাদের করি না স্বীকার—
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে,—

(রাজহংস)

যে-কবি এইভাবে জীবনের জয়গান গাইতে পারেন, এ-যুগের আবিলতাকে ঘৃণা কোরেও যিনি সুন্দরের বন্দনাগান গাইতে পারেন, যিনি কলুষ ও কদর্য্যতাকে জীবনের পরিপূর্ণ সত্য বোলে স্বীকার করেন না, যিনি পীড়িত ব্যথিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের আশার বাণী শোনাতে কার্পণ্য করেন না, তাঁর সেই গান, সেই সৌন্দর্য্য, সেই সহানুভূতি অমূর্ত্ত হোলেও, তিনি আমাদের কাছে অবশ্যই বরেণ্য। সজনীকান্ত দাস সাম্যবাদী বিপ্লবী কবি নন, সাম্যবাদ তাঁর কাছে অস্পষ্ট, বিপ্লব বা বিদ্রোহ তাঁর নিরাকার, আশা তাঁর কল্পনার পার্শ্বচর, মন তাঁর সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত নয়, এ-যুগের যে-সত্য শ্রেণী-সংগ্রামকে অবশ্যম্ভাবী স্বীকার কোরেও জয়াশায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি, কিন্তু তাহোলেও তাঁর কাব্যের অনুপ্রেরণা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, নির্ম্মম সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের জয়যাত্রার পথে সে-প্রেরণা আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। হতাশা, কদর্য্যতা ও বীভৎসতাকে এ-যুগের বাস্তব সত্য বোলে প্রচার কোরে তিনি মানুষকে অবসাদের ও মৃত্যু-বিভীষিকার ক্লীবত্বের পথে টেনে আনেন না। ‘বিকৃত ক্ষুধার আধুনিক ফাঁদে কভু কাঁদে নাই পুরাতন ভগবান’—এ-সত্যকে স্বীকার কোরেও তিনি যখন বলেন, ‘দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল’, ‘সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত’, ‘শুধু হাসে মহাকাল’,—তখন আমরা বুঝতে পারি যে মধ্যযুগের মোহ তাঁর কাটেনি আজও, সে-যুগের জীবন-মৃত্যুর ‘প্রতীক’ সব তাই বার

বার তাঁর বর্ত্তমানের কাব্যের মধ্যেও অজ্ঞানে প্রবেশাধিকার পায়। প্রবেশাধিকার পায় তার কারণ তিনি ভবিষ্যতের 'বাস্তবতর' সত্যটিকে উপলব্ধি কোরেও, এ-যুগের বাস্তব 'সত্য'টি, যা সংখ্যালঘিষ্ঠ মনুষ্যরূপী পশুশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে ভবিষ্যতের জীবনের সাম্যের, স্বাধীনতার, শ্রেণীশোষণশূন্য সভ্যতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তাকে উপলব্ধি করতে পারেননি, বা সংস্কারের জন্যে করতে রাজী নন। সত্য ধ্রুব নয়, অচঞ্চল নয়, এ-যুগের চঞ্চল ও গতিশীল সত্যের ভিতর দিয়ে আমরা বৃহত্তর, সুন্দরতর সত্যে পৌঁছব, এবং এ-যুগের কবির কাছে সেই গতিশীল, চঞ্চল সত্যও ভালবাসা পাবে, যেমন পাবে ভবিষ্যতের সুন্দরতর সত্য। 'বিজ্ঞানে আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ শতাব্দীতে···কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়'—এ-কথা আজ তাঁর মনে হানা দেয় এবং তাঁকে ব্যথিতও করে, কিন্তু তবু তিনি বোঝেন না যে যে-সত্য, যে মুক্ত প্রমিথীউস্, বরুণ প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ ও সংহত শক্তি বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে, সে-শক্তির বা সে-সত্যের ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় তিনি পাননি, শুধু তার হাড়ভাঙা ঘর্ঘরানিই শুনেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এখনো যেজন্য বলেন 'বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে' এবং যেজন্য 'মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ' সমস্ত অঙ্কের এ-পিঠে তাঁর থাক বোলে কামনা করেন, সজনীকান্ত দাসও সেইজন্য 'দেবতা-বিরোধী' হয়েও, 'বন্দি মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, পীড়িত মানুষ—তবু মানুষের জয়'-গান গেয়েও ভাবেন, 'জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্ব্বিকার', আর বলেন 'অতীত কখনো প্রবল কভু বা প্রবল ভবিষ্যৎ —দুয়ের দ্বন্দ্বে মোদের বর্ত্তমান'। এই দ্বন্দ্ব দু'জনেই কাটিয়ে উঠুন আমরা কামনা করি, যুগের আহ্বানে যুগ-সত্যটিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি কোরে তাঁরা সাড়া দিন নির্ভয়ে, আমরা প্রেরণা ও শান্তি পাই। যুগ-সত্যটিকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার কোরেও তাঁরা দেখবেন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে কোনো বাধা নেই, মানুষকে আশার বাণী, জয়ের ও সাম্যের গান শোনাতে প্রবল ইচ্ছা জাগবে, অথচ বিকৃত ক্ষুধার ফাঁকে 'বন্দী ভগবান' কাঁদবেন না, ইলেকট্রণের 'তামাসা' স্মরণ করতে হবে না, 'শিবের জটাজাল' আকাশে উড়বে না, 'মহাকাল' অট্টহাসি হাসবে না,

'সম্রাট'-কবির সাম্রাজ্যও বজায় থাকবে, 'রাজহংস' নিষ্ঠুর শিকারীর গুলির আঘাতে ডানা ঝাপ্‌টে মাটিতে পড়লেও আবার ডানা মেলে উড়তে থাকবে। এই যুগ-সত্যটিকে উপলব্ধি করতে হোলে তাঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সংস্কার থেকে মুক্ত হোতে হবে, এবং অন্তরটিকে রাখতে হবে সচেতন-সযত্নে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর অন্তরের পাশে।

তবু আজ আমরা বাংলাদেশের এই দুইজন কবির জন্যে গর্ব্ব অনুভব করি, এবং তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় পল্লী-সংস্কৃতি ও ধনতান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে যে সংশয়, দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস অবিশ্বাস, আশা-নিরাশার সংগ্রাম চলেছে, তাঁরা সেই মনের কথাটিকে সুন্দর ও সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যে। সেইজন্য তাঁদের কাব্য যেমন নীরস, প্রাণহীন প্রজ্ঞা-সাধনায় ক্লিষ্ট নয়, তেমনি অনাবিল সৌন্দর্য্যের, আশার ও স্বপ্নের সুর তাঁদের কাব্যে অনুরণিত হোলেও রবীন্দ্রনাথের শান্ত সমাহিত প্রকোষ্ঠ থেকে তা সামনের জীবন্ত, চঞ্চল, মুখর, সংগ্রামরত পৃথিবীর দিকে পা বাড়িয়েছে স্বীকার করতেই হবে। এবং যেহেতু দু'জনই গতির নেশায় বিভোর থাকতে ভালবাসেন, সেইজন্য আমাদের অনুরোধ তাঁদের সেই গতি-বাসনা 'বলাকা'-র মতো 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে' বোলে দৃষ্টির বাইরে মহাশূন্যে যেন না উধাও হয়ে যায়, বা আঘাত খেয়ে যেন পশ্চাতের দিকে না পক্ষ বিস্তার করে। মানুষের এই পৃথিবীর বুকের উপরেই গতির নেশায় তাঁরা সম্মুখের দিকে এগুতে থাকুন। 'রাজহংস' নেমে আসুক মাটির বুকে, আর 'সম্রাট' ঐ অপ্রীতিকর সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা ছাড়ুন, ওতে শান্তি নেই, পৃথিবীটা একটা 'সমবায়-সমিতি' হোলে তাঁর সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যকে তিনিই তখন হিংসা করবেন আজকের দৃষ্টি দিয়ে।

তারপর বুদ্ধদেব বসু। এ-আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু-র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই, কারণ সাম্প্রতিক কবিদের যদিও তিনি একজন, তবু তাঁর কবিতা সাম্প্রতিক নয়। এখনো তিনি নির্ব্বিবাদে 'রোমান্টিক' কবিতা রচনা করেন, এবং সে-রোমান্টিসিজম্‌ তাঁর কাব্যলোক ও নারীর কদর্য্য দেহলোককে কেন্দ্র কোরে শূন্যযাত্রা করে, এলোমেলো ছন্দে। মধ্যে মধ্যে তিনি সমসাময়িক

পরিপার্শ্বের দিকে ফিরে তাকান, কিন্তু সেটা অন্তর থেকে নয়, হঠাৎ-বক্তৃতায় বশীভূত হয়ে। তাঁর ‘বন্দীর বন্দনা’ বা ‘কঙ্কাবতী’-র মধ্যে কোনো নূতন সুরের ধ্বনি আমরা শুনতে পাইনে, একমাত্র অমিল ছন্দ ও অর্থহীন শব্দবয়ন ছাড়া। সেই ছন্দের নাটকীয় বেগও উল্লেখযোগ্য। শাপভ্রষ্ট দেবশিশু কবি রূপ-যৌবন-বাসনা-প্রেম সবকিছুর বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন, কারণ লোলুপ যৌবনের কুৎসিত বাসনা-কামনা তাঁর ‘কবিতা-কল্পনা লতার’ কাছে পৌঁছবার পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। তিনি কৃশকটি পীনজঘনা নারীর রতিক্রীড়াতে বিচলিত হোতে চান না, তিনি চান ‘সবিতার দীপ্তিসম’ তাঁর ‘কবিতার স্বপ্ন’-কে অমর করতে। তাই এই ধরণীর নারী তাঁর কাছে চামড়ায় ঢাকা রক্তমাংসের নৈবেদ্য মাত্র, কাম ক্ষুধা তৃপ্তির জন্যে। তাঁর চোখে ও হৃদয়ে যে দিব্য আলোক ও অনন্তের তৃষ্ণা আছে, তাঁর নারীর মধ্যে তার অভাব। তাই ননীর মতো তনুর স্পর্শের বিলাসে তিনি নারীকে, ‘কঙ্কাবতী’-কে চেয়েছেন।

> ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
> তেমনি তোমার প্রেম কোন্ প্রেতে করিছে গোপন—
> তাহা কহিবো কি ?
> আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলই জেনেছি।
> মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি দাও সুন্দর লজ্জায়,
> জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো এক রাতে ;—
> (তখন কোথায় আমি ?)
> যে-শঙ্কার শিহরণ তব দেহ-লাবণ্যেরে মোর কাছে করেছে মধুর,
> (ওগো কঙ্কাবতী—
> মধুর ! মধুর !)
> জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
> পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
> আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি।

—ইত্যাদি, ইত্যাদি। শেষকালে ‘কঙ্কা গো !’ ‘কঙ্কা গো !’ বোলে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, এবং ‘রাঙা-ভাঙা চাঁদ’ দেখতে দেখতে তিনি

হাওয়ায় 'বেহালা' বাজানা শুনেছেন। আমরা শুনেছি তার মধ্যে দুর্গন্ধি দৈহিক ও যৌন বুভুক্ষার কাতরানি ও গোঙানি, মদন আর রতির অসুন্দর 'লীলাখেলা' এবং দেখেছি নিপীড়িত, অবদমিত যৌনাকাঙ্খার বিকৃত প্রকাশ।

সাম্প্রতিক কবিদের দ্বিতীয় দলেব মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা সকলেই প্রায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত পণ্ডিত অধ্যাপক, পৃথিবীর হালচাল ভালভাবে জানেন, এবং নিভৃতে মনীষা-সাধন করাই এঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। এঁদের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর বাইরে দেশের বাকি সব মানুষকে এঁরা অপগণ্ড ও মূর্খ ভাবেন, সুতরাং এঁরা যা কিছু রচনা করেন তা শুধু গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দের জন্যে। একজন কবি আর একজনের পুস্তকে মুখবন্ধ লিখে দেন, অন্য একজন নিজেদের পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে নানারকম যুক্তির অবতারণা কোরে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বোলে প্রচার করেন। এককথাতে বলা চলে যে এঁদের গোষ্ঠীর গঠনটি বেশ মজবুত, কাব্যরচনা ও কবিপরিচয়ের সব বন্দোবস্তই ভালভাবে করা আছে। কিন্তু এগুলোর তেমন কোনো মূল্য নেই। এঁদের একটি বিশিষ্ট 'মতবাদ' আছে, যেটি বোঝবার জন্যে আজকের দিনে অন্তত আমাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। মতবাদটি হোচ্ছে এই—আজকের সমাজে যে-বিশৃঙ্খলা, যে-নৈরাশ্য, যে-কদর্য্যতা চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেইটাই সমসাময়িক কবির জীবনের চরম সত্য। পৃথিবীতে আজ শান্তি নেই, মানুষের শুভবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, জীবন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছে, সুন্দর নির্ব্বাসিত হয়েছে। কবি এই পৃথিবীর, এই সমাজের মানুষ, সুতরাং আজ আশার বাণী, কল্যাণের বাণী তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে না, আজ তিনি যেহেতু পঙ্গু, বিকৃত, খঞ্জ, ব্যর্থ, পৌরুষহীন ক্লীব, সেইজন্য পঙ্গু, বিকৃত, ক্লীব ও ব্যর্থ জীবনের গান গাওয়া তাঁর পক্ষে অতি-স্বাভাবিক। সমাজের যেদিন পরিবর্ত্তন ঘটবে, জীবন যেদিন সুন্দর হবে সেদিন এঁদের কাব্যের সুরও বদলাবে। অর্থাৎ যে ব্যর্থতা ও ক্লীবত্বের কুষ্ঠরোগে এঁরা আজ আক্রান্ত, যতদিন সে-রোগের কোনো 'দৈব শক্তির' দ্বারা নিরাকরণ না হোচ্ছে, ততদিন বিনা চিকিৎসায়, এমনকি চিকিৎসার জন্যে কোনোরকম চেষ্টাও না কোরে, তাঁরা শুধু হাতপা

ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রণায় গোঙাবেন। আমি এঁদের কয়েকজনের মতামত উদ্ধৃত করছি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "অদৃষ্টগতিকে আমিও সেই পঙ্গু সমাজের সভ্য।···আমার কবিপ্রতিভার অভাব বিরূপ পরিমণ্ডলের অভিশাপ।" সমর সেন বলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো আমূল সমাজবিপ্লব না ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না ধরে, ততদিন এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস, বর্ত্তমান সভ্যতার যেগুলি বিশেষত্ব, তাঁদের ঘিরে থাকবে, ততদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূলসূত্রের অভাবে পীড়িত হবে। ইতিমধ্যে নেই মামার চেয়ে কানা মামার অন্বেষণ করাই ভালো।" এঁদের সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন, "চিরাগত বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভিৎ গেছে ভেঙে, তার ভগ্নস্তূপের উপর নূতন যুগের ইমারত যতদিন না মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন আমাদের কবিদের গলা শোনাবে 'শান্ত অর্থহীন, যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।' ততদিন আমরা কেবল চেয়ে দেখব চারিদিককার প্রাণস্পন্দিত শ্যামলিমা যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে, যেখানে বনস্পতি ছায়া বিস্তার ক'রে ছিল সেখানে রইল শুধু রিক্ত বিস্তৃত মরুভূমি।" আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।*

---

* উদ্ধৃতিগুলি 'কবিতা' পত্রিকা (বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫) থেকে গৃহীত হয়েছে। উক্ত সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এর 'স্বগত', সমর সেন-এর 'বাংলা কবিতা' এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পঠিতব্য। 'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুব মার্কসীয় সমালোচনা সম্বন্ধে যে 'পাণ্ডিত্যের' পরিচয় দিয়েছেন, সেই পাণ্ডিত্যের চরম ও 'স্বাভাবিক' পরিণতি আমরা দেখেছি 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের মধ্যে মঃ আইয়ুব তাঁর 'কানা মামা' কবি সমর সেনকে 'সাম্যবাদী' কবি বলেছেন: "অন্যদিকে সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবিও রয়েছেন···এঁরা প্রায় বালক বয়সেই অনুকারকের দল সৃষ্টি ক'রে (সমর সেনের তো রীতিমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে) আধুনিক বাঙলা কাব্যে আসন পাকা করেছেন।" যেহেতু কর্ত্তব্যবোধের প্রবর্ত্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত সভাসমিতি কোরে বেড়িয়ে, দৈনিকে সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখে বা জেল খেটে সমর সেন কবিতা লেখেন না, অতএব আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর যুক্তি অনুযায়ী সমর সেন

উপরে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার মূল কথা হোচ্ছে 'শিল্পের খাতিরে শিল্প' এই বহু পুরাতন অর্থহীন বাণীটি প্রচার করা। অথচ সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হোচ্ছে এই যে উক্ত কবি ও সমালোচকেরা এই বাণী আজ ঘুরিয়ে প্রচার কোরে বাংলাদেশে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী লেখকের সম্মান দাবী করেন। 'শিল্পের খাতিরে শিল্পের' একজন প্রধান অধিবক্তা বেনেডেটো ক্রোচে সমাজ ও শিল্পীর সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে সমাজের মধ্যে যতদিন কদর্য্যতা বা বীভৎসতা থাকবে ততদিন শিল্পী তাকেই রূপায়িত করবেন, কারণ রূপায়িত যখন সে হবে তখন কুৎসিত আর সে থাকবে না। ক্রোচে আরও বলেছেন যে এতে সমালোচকেরা যদি ক্ষুণ্ণ হন তাহোলে উপায় নেই, কারণ সমাজকে তাঁরা যতদিন না সুন্দর ও মনোরম করছেন ততদিন শিল্পীর দ্বারা তাঁদের মনোরঞ্জনের কোনো উপায় নেই। এখানে ক্রোচে বিষয়ীকেই সর্ব্বপ্রধান করেছেন এবং বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যে সম্বন্ধ তাকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে পারেননি। সমাজের সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ যে যান্ত্রিক নয় এ-কথা মার্কস্‌ও বলেন, কুৎসিত বা কদর্য্য ছবি যে শিল্পে রূপায়িত হবে না তাও নয়। কিন্তু যেহেতু সমাজ বা মানুষের জীবনের মূল ঐতিহাসিক প্রবাহ কদর্য্যতাকে ছাপিয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে, সেইজন্য বাইরের সাময়িক বিশৃঙ্খলা বা কদর্য্যতা 'ঐতিহাসিক বাস্তব', সুতরাং 'সামাজিক বাস্তব' নয়। শিল্পীর অন্তত সেই প্রবাহ বা সেই 'ঐতিহাসিক সত্য' উপলব্ধি করবার মতো দৃষ্টির গভীরতা থাকবে, তা না হোলে শিল্পীর সঙ্গে স্টুডিও ক্যামেরাম্যানের কোনোই পার্থক্য থাকে না।

একজন নিঃসন্দিগ্ধ সাম্যবাদী কবি, শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে তাঁর নাকি স্কুলও গড়ে' উঠেছে। অর্থাৎ যুক্তিটা দাঁড়ায় এই—সাম্যবাদী কবি হোতে হোলে ন্যাবায় ভুগতে হবে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে হবে, বাতগ্রস্ত রুগীর মতো শুয়ে এলিয়ট্-পাউণ্ড-অডেন্ পড়তে হবে, এবং 'কালীঘাট ব্রিজের উপর লম্পটের পদধ্বনি' বা 'নারীধর্ষণের ইতিহাস' লিখতে হবে। দুঃখের বিষয়, আমরা মনে করি, সাম্যবাদের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের জন্যে এরকম নিঃসন্দিগ্ধ 'সাম্যবাদী' কবির উচ্ছেদ প্রয়োজন, পরে আত্মহত্যার চাইতে সেইটাই বোধ হয় মঙ্গলের পথ। 'আইয়ুবীয় সাম্যবাদ' যেকোনো '—বাদ' হোতে পারে, মার্কসীয় সাম্যবাদ নয়।

অন্তর্জগতের উপর প্রাধান্য আরোপ করবার জন্যে এবং বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সমন্বয়-সাধনে ব্যর্থ হয়ে ক্রোচে বিরোধী মতামতের জালে জড়িয়ে পড়েছেন।* বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী মার্কস্‌বাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আজ এই ক্রোচের আত্মকেন্দ্রিক শিল্প-দর্শনকেই প্রচার করছেন। এবং তাঁদের বাইরের 'সমাজতন্ত্র', 'সাম্যবাদ', 'মার্কস্' প্রভৃতি শব্দের আভরণ খসিয়ে ফেললে ভিতরে দার্শনিক ক্রোচের স্বাবলম্বী শিল্পের বাণী—"শিল্পের খাতিরে শিল্প"—বেরিয়ে পড়বে। তাঁদের যুক্তির এই কুয়াশাজাল আজ এইভাবে ছিন্ন করা একান্ত প্রয়োজন এইজন্যই যে এতে শুধু মার্কস্‌বাদ যে বিকৃত হবে তা নয়, ভবিষ্যতের সাহিত্য যা আজকে এ-দেশে অংকুরিত হোচ্ছে, তা' বিপন্ন ও বিপথগামী হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

এই কবিগোষ্ঠীর কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ এঁদের কাব্য-ব্যাখ্যাকে সমর্থন কোরেও, কুৎসিত কাব্য-সৃষ্টিকে অনিবার্য্য স্বীকার কোরেও বলতে হয় যে অনেকে কাব্যই সৃষ্টি করেননি, এমনকি গদ্য হিসাবেও তা অপাংক্তেয়। এঁদের

* শিল্পীর অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সমালোচকদের ক্রোচে বলেছেন : "...if these expressions really are perfect, there is nothing to be done but to advise the critics to leave the artists in peace, for they can only derive inspiration from what has moved their soul. They should rather direct their attention towards effecting changes in surrounding nature and society, that such impressions and states of soul should not recur. If ugliness were to vanish from the world, if universal virtue and felicity were established there, perhaps artists would no longer represent perverse or pessimistic, but calm, innocent and joyous feelings, Arcadians of real Arcady." (Aesthetic—Benedetto Croce).

ক্রোচের এই মতের সঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব, সমর সেন প্রভৃতির মতামত মিলিয়ে দেখলে কোনো পার্থক্যই চোখে পড়বে না, একমাত্র যুক্তির অবতারণার প্রভেদ ছাড়া।

এই বিষয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি আমার 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ' নামক পুস্তকের 'প্রথম খণ্ডের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে। অধ্যায়টির নাম "শিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ।"

মধ্যে একমাত্র কাব্য-প্রতিভায় বিশুদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর মধ্যে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে ভাবনিষ্ঠা, ছন্দনৈপুণ্য ও শব্দ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বহু সাম্প্রতিক কবির মধ্যে বিরল। যেমন

উদয়শৈল 'পরি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু রভসে,
শাপবিমোচিত সন্নত ধরণী তারক তাপক পরশে।
উতল কমলবন গন্ধে,
মন্দ্রে মধুকর ছন্দে,
বৃক্ষ বিনতি করি বন্দে,
সাগর উচ্ছল হরষে।
উদয়শৈল 'পরি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু রভসে।
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

—পড়লে কাব্য হিসাবে অস্বীকার করবার উপায় থাকেনা, এবং ছন্দের দিক দিয়ে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কথা মনে হয়,

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কৈ গো কৈ মেঘ উদয় হও ;
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের উঠুক ধুম।
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এখানে শব্দ শুধু অর্থঘন নয়, ভাবঘন এবং আবেগঘন। অর্থের গৌরবে এবং ভাবের ঐশ্বর্য্যে ও জাদুতে সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসীর' অনেক কবিতা এই ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় সুধীন্দ্রনাথ ছন্দের দিক দিয়ে, শব্দ বয়নে ও চয়নে প্রাচীন সংস্কৃত-পন্থী। তাঁর মনের এই গভীর ও শান্ত অন্তঃপ্রবাহ সাময়িক যুগসমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে আত্ম-সমাহিত রূপ ধারণ করেছে। এ-দেশের প্রাচীন মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হঠাৎ-বর্দ্ধিত নাগরিক সভ্যতার অদ্ভুত আঙ্গিক মিশ্রণের অদ্ভুততর প্রতিভাসন দেখতে পাই তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে, যেখানে এলিয়ট্-পাউণ্ড প্রমুখ সাম্প্রতিক কবিদের বহু 'প্রতীক' তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করেছেন তাঁর

অভিজাত সাংস্কৃতিক শব্দের ও ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে। তার সঙ্গে তাঁর এলিয়টীয় ও পাউণ্ডীয় পাণ্ডিত্যও যুক্ত হয়েছে। ফলে কাব্যরস ব্যাহত হয়েছে, এবং দুর্ব্বোধ্যতা ও উদ্ভটত্বের জন্যে ক্রমে ক্রমে তাঁর কাব্য তাঁরই চতুঃপার্শ্বের পরিচিতদের উপভোগ্য হয়েছে। যেমন 'উটপাখী' কবিতাটি। মরুবাসী উটপাখীর একটি বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে বিপদের সময় বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা, যদিও এ আত্মরক্ষার উপায় মিথ্যা অধ্যাস ভিন্ন কিছুই নয়। 'উটপাখী'-কে কবি নিজেরই মানসিক 'প্রতীক' হিসাবে সম্বোধন করেছেন। আজকের মরুসমাজে এভাবে বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষা অর্থহীন জেনে কবি মধ্যে মধ্যে আত্মরতিতে বিরক্তি অনুভব করেন। তাই কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে তিনি নূতন সংসার বাঁধতে চান। কবিতাটির এই অর্থ পরিষ্কার নয়, কারণ কবির সংবেদন ও অন্তরানুভূতি এখানে শুধু প্রতীকী শব্দের ভিতর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

আমার কথা কি শুনতে পাওনা তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্ব্বাক, নীল, নির্ম্মম মহাকাশ।

নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।

তোমার নিবিদে বাজাবোনা ঝুমঝুমি,
নির্ব্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়া-জুড়নো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে ॥

('উটপাখী'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

'নরক', 'উজ্জীবন' প্রভৃতি কবিতার পৌরুষময়, চিত্রাত্মক বর্ণনার মধ্যে তাঁর অদ্ভুত উপমা ও অনুপ্রাস দেখে মনে হয় কষ্টকল্পিত, এবং কষ্টকল্পনা কাব্যের শত্রু। যেমন

রক্তহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্ব্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে।

(নরক)

অথবা—

অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম, নিরুপম,...

(নরক)

নিশ্চিহ্ন সে-নাচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্ব্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি;
আত্মহা অসূর্য্যলোক; নক্ষত্রেও লেগেছে নিচুটি।

(উজ্জীবন)

শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ যাই হোক, অর্থ ও ভাবের কাব্যিক সমন্বয় এখানে হয়নি। ক্রমে ক্রমে সুধীন্দ্রনাথ আত্মরতিক্রীড়াতেই মনোযোগ দিয়েছেন বেশী, এবং তাঁর কাব্যের দুর্ব্বোধ্যতা ও উদ্ভটত্ব তারই স্বাভাবিক পরিণতি। অথচ তাঁর শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, কাব্যে এই মনীষা, প্রজ্ঞা, আধুনিকত্ব ও প্রাচীনত্বের অভাবনীয় সংমিশ্রণ কি এ-দেশের মধ্যযুগীয় পল্লী-সংস্কৃতি এবং অকালপক্ক নাগরিক সভ্যতার পরিণয়-পরিহাস? সবই কি নির্ম্মম বিদ্রূপ?

বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর কাব্যালোচনার সময় কে কার কার্ব্বন্-কপি বোঝবার উপায় নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, ভাব ও বিদ্রূপ-প্রকাশের ভঙ্গিমার মধ্যে দু'জনেরই অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাঠিন্য ও সরলতায় দীপ্যমান 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্'-এর কবি বিষ্ণু-দে-র সঙ্গে 'চোরাবালি'-র কবির কোনো সম্বন্ধ নেই, এবং 'চোরাবালির'

কবি ও 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ'-এর কবি সমর সেন-এর অনেকদিক থেকে মিল আছে। নির্বীর্য্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতি দু'জনেই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন, বিষ্ণু দে-র বাণগুলি চোখা, সমর সেন-এর ভোঁতা। উদাহরণ-স্বরূপ আধুনিক প্রেম সম্বন্ধে দুই কবির মনোভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মহা মুস্কিল!
ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে!
... ...
কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,—
...
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে।
এমন কি সেই আঁচিলটা—তা-ও!
সেটাও জানি!
নতুন ত নেই কিছুই! এখন করব কি যে!
করব কি যে!
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব নাকি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে?
ক্লান্ত লাগে। (বিষ্ণু দে)

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে,
অনেকদেশে যখন অজস্রজলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ,
সহরের রাস্তায় যখন
সদলবলে আর্ত্তনাদ করবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক,
তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে? (সমর সেন)

দু'জনের বিদ্রূপের ভঙ্গী প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা কোনো প্রাচীন কবিতা ও গানের লাইন কবিতার মধ্যে জুড়ে এঁরা রাবিন্দ্রিক ও প্রাচীন মনোভাবকে বিদ্রূপ করেন। তাছাড়া বিদ্রূপের নাগরিক উপকরণও প্রায় দু'জনেরই এক।

মরীয়া লিবিডো আজো কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়,
ওড়েনি, ওড়েনি আজো কঠিন সঙ্গীন
সর্ব্বকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের ব্যূহদ্বারে।

(বিষ্ণু দে)

প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্‌ব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো,···

(সমর সেন)

দিনের ভাটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধূ ধূ করে,···

(সমর সেন)

সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

(সমর সেন)

সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাবো!

(সমর সেন)

মেম্‌ননের স্তব্ধ মূর্তি
রাত্রি হয়ে এল শেষ
এবার ফিরাও মোরে।

(সমর সেন)

আজ বহুদিনের তুষার স্তব্ধতার পর
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

(সমর সেন)

কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনিতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর!

(সমর সেন)

কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ···

(সমর সেন)

পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ !
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি,'
সুরেশ শুধু খায় দেখি মুকোজ্ !

(বিষ্ণু দে)

জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগেও ভাবিনি কখনো···

(বিষ্ণু দে)

এছাড়া প্রতীচ্যের সাম্প্রতিক কবিদের কাছ থেকে উপমা ও প্রতিরূপ পর্য্যন্ত এঁরা ধার নিয়েছেন। যেমন

আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?

(বিষ্ণু দে)

Living from day to day provides no clue
From certain happiness—
The rakes bravado and tedious libido
Gin in small hours, praise for the cunning ruse.

(Clere Parsons)

আমার স্নায়ুতে এসে' কাঁপে থরো থরো
দুয়ারে:প্রতীক্ষারত উদ্ধত ট্যাক্সির মতো ?

(বিষ্ণু দে)

.. When the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting

(T. S. Eliot)

—ইত্যাদি। ভাবকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করবার জন্যে উপমা ও অনুপ্রাস কাব্যে অবশ্যম্ভাবী। রূপের সাদৃশ্য থেকে যেমন উপমার জন্ম, শব্দের সাদৃশ্য থেকে তেমনি অনুপ্রাসের জন্ম। কিন্তু উক্ত কবিরা কৃত্রিম উপমা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাস ব্যবহার করেন ভাবের শোচনীয় দৈন্য এবং অন্তরের অকবিসুলভ শুষ্কতা ঢাকবার জন্যে। এইরকম নীরস কৃত্রিম উপমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত সাপের মতো।

(সমর সেন)

এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো,

(সমর সেন)

হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড় ;
এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের শকুনের মতো।

(সমর সেন)

তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন পিচ্ছিল স্বেদাক্তত্বক্ সাপ।

(বিষ্ণু দে)

ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
কি কথা পাই ?

(বিষ্ণু দে)

শূকরের চামড়ার মতো যখন অন্ধকার ঝুলতে থাকে, বা উড়ন্ত সাপের মতো ডানা ঝাড়তে থাকে, সন্ধ্যা যখন নামে শীতের শকুনের মতো, স্বেদাক্ত-ত্বক্ যখন সাপের মতো পিচ্ছিল, আর মুখ যখন ডিমের মতো পাণ্ডু, তখন ঠিক এই শ্রেণীর উপমা দিয়ে বলা যায় না কি, যে এই কবিদের মন, কোনো ঘিন্‌ঘিনে গলির মধ্যে ডোমের দৃষ্টির বহির্ভূত মরা ঘেয়ো কুকুরের মাস্তে-পড়া নাড়ীভুঁড়ির মতো ? কবির অনুকরণে সমালোচকের কোনো দোষ নেই।

তারপর এঁদের নৈরাশ্য, ক্লীবত্ব, ধূসরতা ও 'হাহাকারত্বের' সামান্য পরিচয় দেওয়া উচিত। নিজের পৌরুষহীনতা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন যে

বিষ্ণু দে তা তাঁর 'ফাঁকা' লিবিডোর উল্লেখ দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া তিনি যখন বলেন

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

(ঘোড়সওয়ার)

—তখন তাঁর সাময়িক পৌরুষহীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এবং সমর সেন যে নপুংসক-মনোভাবাপন্ন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন,

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

(একটী বুদ্ধিজীবী)

সমর সেন-এর কবিতার মধ্যে 'হাহাকার' ও 'ধূসর' শব্দের অসহ্য পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয় ভিতরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। যেমন

হাওয়ায় এলোমেলো ফুলের গন্ধ
আর দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে তীব্র, নিঃশব্দ কিসের হাহাকার।

(গোধূলি)

দেখি আর শুনি
গন্ধ-স্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার :

(একটি রাত্রের সুর)

ক্লান্ত স্তব্ধতার মতো,
সে পথে দক্ষিণ হ'তে হঠাৎ হাহাকার এলো।

(নাগরিকা)

শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইসারা,
কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।

(নাগরিকা)

উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যুহীন অতীতের শেষ হাহাকার।

(মেঘদূত)

সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

(সাড়া)

রাত্রিশেষে কলের বাঁশীর তীব্র হাহাকার
ধ্বনিত হোলো দিগন্ত থেকে দিগন্তে

(শেষরাত্রে)

অন্ধকার ধূসর, সাপের মত মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহ-রেখার সহসা শিহরণ,—

(একটি রাত্রের সুর)

রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
ধূসর আকাশ ;

(একটি প্রেমের কবিতা)

তোমাকে বললাম—এসো,
তোমার ধূসর জীবন হ'তে এসো,

(ইতিহাস)

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি…

(মুক্তি)

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ.
পিচের পথে—

(ভোরের কলকাতা)

এইরকম উদ্ধৃতিতে অনেকগুলি পৃষ্ঠা পূরণ করা যায়, কিন্তু অনর্থক পৃষ্ঠা পূরণে আপত্তি আছে। সমর সেন-এর কবিতাগুলির ভিতর থেকে যদি

'ধূসর' ও 'হাহাকার' শব্দ হু'টি বাদ দিয়ে পড়া যায় তাহোলে বাকি যা থাকবে তাতে মনোবৈজ্ঞানিকের কৌতূহল জাগতে পারে, সমালোচকের নয়। অতএব এইখানেই 'আইয়ুবীয় সাম্যবাদী' কবির আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানলাম।

তৃতীয় দলের সাম্প্রতিক কবিরা সকলেই প্রায় বয়সে তরুণ। তরুণ হোলেও ইতিমধ্যে তাঁরা যে কবিতা লিখেছেন তার মূল্য বয়ঃজ্যেষ্ঠদের তুলনায় নেহাৎ কম নয়। এঁরা সকলেই সাম্যবাদী কবি, যাঁরা পূর্ব্বোক্ত সমালোচক মিঃ আইয়ুব-এর ভাষায়, '...যে-কর্ত্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত সভাসমিতি ক'রে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন।' এটা ঠিক যে এঁরা এইসবের অনেক কিছুই হয়তো করেন, কিন্তু 'ধূসর' কবিরা 'নপুংসক' মনের বৃশ্চিকদংশনে যদি কবিতা লিখতে পারেন, এবং সে-কবিতার টিকা করতে যদি মিঃ আইয়ুব-এর মতো পণ্ডিতকেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হোতে হয়, তাহোলে কর্ম্মময় জীবনের বা স্বপ্নময় ভবিষ্যতের অনুভূতিতে বা উত্তেজনায় এঁদের কবিতা লেখাও মার্জ্জনীয়।

এই তরুণ কবিদের মধ্যে অরুণকুমার মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার দত্ত, পরেশনাথ সান্যাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সাম্যবাদী কবি বোলে সাম্যবাদ-বিরোধীদের নাসিকা কুঞ্চিত করা উচিত নয়, এবং সেই শুচিবায়গ্রস্ত মন নিয়ে এঁদের কাব্যও বিচার করা অন্যায়। শুধু এইটুকু ভাবা প্রয়োজন যে যে-জীবন-দর্শনে এঁরা বিশ্বাস করেন তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বাস্তব সত্যের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা, তা জীবন্ত ও সুন্দর কিনা, এবং 'জীবনের সমালোচনা' হিসাবে তার কতখানি মূল্য আছে। সাম্যবাদীর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন বোলে এঁরা সমসাময়িক বিশৃঙ্খলা, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যকে অতীতের দায়ভাগ এবং ভবিষ্যতের পাথেয় বোলে ভুল করেন না, তাকে সত্য বোলে স্বীকার কোরেও ঐতিহাসিক আবর্ত্তের লীলাচঞ্চল তরঙ্গশীর্ষের উপর দিয়ে জীবনের সুন্দরতর বিকাশের বৃহত্তর সত্যের আলোকের দিকে চেয়ে থাকেন। পরিপার্শ্ব তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী বোলে, তার

অবিনশ্বরতায় তাঁরা অবিশ্বাসী, এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে তাঁদের বাধা নেই। তাঁরা যেহেতু জীবনের মূল স্পন্দনটি অনুভব করেছেন—বিরোধে ও সমন্বয়ে সুন্দরতর বিকাশ—সেইজন্য খণ্ড বাস্তব তাঁদের বাস্তব (Reality) বা সত্য (Truth) নয়, সমগ্র বাস্তব, যা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সম্মিলিত কেন্দ্রজাত, তাই তাঁদের বাস্তব। সুতরাং অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যকে তাঁরা জীবনের সত্য বোলে স্বীকার করেন না, এবং বিশ্বাস ও আশাই যখন তাঁদের মূলধন, তখন আংশিকভাবে তাঁরাও সকলে যে শেলী-স্পেণ্ডার-ল্যুইস্-এর মতো রোমান্টিক হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই রোমান্টিসিজম্ নভোচারী নয়, এই পৃথিবীর। এই পৃথিবীর কাঁচা টুক্‌রা সত্যগুলিকে নিজের মনের উত্তপ্ত নেহাইয়ের উপর আঘাত দিয়ে এঁরা সোনা ফলাতে চান এই পৃথিবীতে। বার বার এই সোনা ফলেছে এই পৃথিবীতে, আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত, এবং আজ সেই বিপুল ঐতিহাসিক জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে এঁরাও যদি সম্মুখের দিকে, সোনার সত্যের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি মেলেন, তবে সে-দৃষ্টিকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ না কোরে উপায় নেই।

এদিক দিয়ে অরুণকুমার মিত্র-এর অনুভূতির গভীরতা আছে, এবং সে-অনুভূতির প্রকাশও সংহত ও সংযত। নিজেদের শ্রেণী-সংস্কার বা পতনের খানাডোবাগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন নন তা নয়, তাঁর বিশ্বাসী মনেও মাঝে মাঝে সংশয়জাত প্রশ্নের মেঘ স্তবকে স্তবকে ভিড় করে, তিনি কাতর হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ করেন। কিন্তু যে-মন গতিশীল ইতিহাসের সঙ্গে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ জীবনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে, সে-মনের আবেগাঘাতে মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দেবেই দেবে, ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় গুম্‌রে গুম্‌রে নিঃশেষিত হয়ে যাবে না।

আমরা চেয়েছি শান্তি, আজ তার অবসাদে ভারি,
মুমূর্ষু রোদের মত ঝিমানো জীবন ;
আমরা পুষেছি আশা—বিহঙ্গ সে দূর নভোচারী,
মাটিতে ঝরেছে তার পালক চিকণ।

চোখের পাতায় ছিল স্তূপাকার আধ-আধ ঘুম,
স্তিমিত শয়ন-দ্বীপে স্বপন-রচনা ;
আমরা দূরের থেকে দেখিয়াছি আকাশকুসুম—
কোথায় সে ফুল আর কোথা বা কামনা !

(অরুণকুমার মিত্র)

নূতন জীবনের আলোক-স্পন্দন যিনি অনুভব করেন, তাঁর পক্ষে এ-জীবনের পঙ্কিলাবর্ত্ত থেকে মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হওয়া স্বাভাবিক। অরুণকুমারের মধ্যে সেই বালসুলভ উল্লাস নেই, বর্ত্তমানের সংকটঘন মুহূর্ত্তগুলি সম্বন্ধে তিনি হুঁসিয়ার। তাই নূতনকে তিনি অভিনন্দন জানান সংযত কণ্ঠে, সাবধানী অথচ সুনিশ্চিত সুরে। এইখানেই আমি এই কবির বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। কবিতার শব্দগুলি শুধু অর্থঘন নয়, তাদের অন্তশ্ছন্দের গাম্ভীর্য্য, অন্তঃপ্রবাহের সংহত গতির ধ্বনি শুনে মনে হয় সত্যই যেন অগ্রাভিমুখী বিশাল মানব-গোষ্ঠীর স্থির, গম্ভীর ও দৃঢ় পদপাত তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়ে কাব্যে প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে। শব্দগুলি অর্থঘন হয়েও এতো সুন্দর আবেগবাহী ও সংবেদন-ভারাক্রান্ত যে একটিকেও পরিবর্ত্তন করবার উপায় নেই। 'ভূমিকা' শীর্ষক কবিতাটির শব্দগুলির সুন্দর ঐক্য ও অর্থ-সংহতি দেখে মনে হয় যেন ভবিষ্যৎ মানব-গোষ্ঠীর এই-ই অবশ্যম্ভাবী রূপ, এবং সম্মিলিত শব্দের ঐক্যের মধেই কাব্যের 'ব্যক্তিত্বের' চরম বিকাশ।

প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিভে—
অস্থির দিন এসেছে নাকি ?
স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে
রৌদ্রের ডাক হঠাৎ বুঝি !
বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে ;
দ্বীপের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা ;
নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেলো মুছে ;
আজ ইতিহাস শিথিল-স্মৃতি।

পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে,
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে ;
ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে।
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে—
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে,
পায়ের তলায় দ্রুততম হ'ল যেন
বহুদিনকার উধাও গতি।

ভাগ্যের সীমা খড়্গের মতো আসন্ন কি ?
প্রস্তুতি, মানি, সমুদ্ধত ;
তীক্ষ্ণ বাঁশীতে স্বর কেটে গেছে সকাল বেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো।
সংহত বেগ ঘন সঙ্কটে চাপা ;
উড়ন্ত ধুলো কালো মেঘ হ'বে নাকি ?
নিশুতি চাঁদের মমতা তো নেই মনে,
অন্তরায়ণে দিনের সুরু।

(অরুণকুমার মিত্র)

অবশ্য 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটির মধ্যে অনুভূতি কূল ছাপিয়ে উত্তেজনায় রূপ নিয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কবিদের এই উত্তেজনা অবশ্যম্ভাবী, কারণ পরিপার্শ্বে তার প্রচুর উপকরণ থাকে। বিশেষ কোরে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, বা কৃষকদের বিদ্রোহ-কাহিনী সচেতন সাম্যবাদী কবিকে যে উত্তেজনার বশবর্ত্তী করবে তাতে সন্দেহ নেই। সেইরকম উত্তেজনার বশীভূত হয়ে 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি রচিত হয়েছে।

প্রাচীর পত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ—
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরাণো কথার ধার !)
যুগান্ত উৎকীর্ণ ; এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।—

ভিড়ে ভিড়ে খোঁজা ফৌজ তো তৈয়ার
প্রস্তুত হাতিয়ার ;
শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া
দেব্‌তারা পারে ঠেকাতে আর কি, বলো ?
শৃঙ্খলে আসে সৈনিক-শৃঙ্খলা—
উঁচু কপালের কিরীট যে টলোমলো ! (অরুণকুমার মিত্র)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তারুণ্যের স্পর্শ বেশী থাকলেও, তাঁর 'পদাতিক'-এর কয়েকটি কবিতা যে কাব্যের যে-কোনো প্রতিমানে রসোত্তীর্ণ হবে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সত্যই আমরা মুগ্ধ হয়েছি। অন্তত এ-পর্য্যন্ত তাঁর তারুণ্য কাব্য-শক্তি স্ফুরণে সাহায্য করেছে, এবং ইতিমধ্যে তাঁর অদ্ভুত উপলব্ধি-শক্তির সাহায্যে তিনি শব্দের উপর আবেগ ও অর্থের ভার দিয়ে এমন নিপুণভাবে কাব্যে সংযোজিত করেছেন যে "চীন; ১৯৩৮" বা "এখানে"র মতো কবিতা বার বার আবৃত্তি কোরে পড়তে ইচ্ছা করে। যেমন

জাপপুষ্পকে। ঝরে ফুলঝুরি,। জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ। বজ্রে কঠিন। বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের। নিচে উল্লাসী। মুক্তির ডাক—
রাইফেল আজ। শত্রুপাতের। সন্ধান পা'ক।
... ...
প্রান্তিক লোভে। পরজীবীদের। নিষ্ঠুর চোখ
প্রাক্‌পুরাণিক। গুহাকে ডাকলো। ক্ষুরধার নখ,
কমরেড, আজ। অশ্বের খুরে। আনো লাল দিন
দম্পতি রাত। ততদিন হোক। উৎসবহীন।

দুর্ঘটনার। সম্ভাবনাকে। বাঁধবে না কেউ ?
ফসলের এই। পাকা বুকে, আহা। বন্যার ঢেউ ?
দস্যুর স্রোত। বাঁধবার আগে। সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে। জ্বলে ক্যাণ্টন,। জ্বলে সাংহাই ॥
(চীনঃ ১৯৩৮)

কিন্তু ভয় হয় যে যিনি সচেতন হয়েও এমন বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি ক্রমে ক্রমে ব্যঙ্গের দিকে ঝুঁকছেন, এবং সে-ব্যঙ্গ বিষ্ণু দে-র মতো শুধু নীরস বুদ্ধির প্যাঁচকসাতেই উবে যায়, কাব্য হয় না। ব্যঙ্গের এই নেশা শক্তিমান তরুণ কবির অচিরে দূর করা উচিত।

পরেশনাথ সান্যাল খাঁটি রোমান্টিক কবি। প্রশ্ন বড় একটা তাঁর মনে জাগে না, কদাচিৎ কখন যদিও বা জাগে, কল্পনার স্পর্শে তা মিলিয়ে যায়। আগামী কালের স্বপ্নেতেই তিনি বিভোর, সাময়িক দুর্য্যোগকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। করেন না যখন তখন আমাদেরও বলবার কিছু নেই, কারণ আজকের পরিপার্শ্বকে স্বীকার কোরেও যাঁর ভবিষ্যৎ 'বাস্তবতর' ভাববার মতো সাহস আছে, তাঁর সেই সত্যকে অলীক কল্পনা বলাও অর্থহীন। পূর্ব্বেই বলেছি, সাম্যবাদী কবিরা আজ কমবেশী রোমান্টিক হোতে বাধ্য, কারণ সাম্যবাদী সমাজ আজ কবির মনশ্চক্ষুর সামনে কল্পনায় বিরাজ করছে। এই কাল্পনিক কবিতার সঙ্গে আদিম কবিতার সাদৃশ্য আছে। আদিম মানুষ যে বৃষ্টি, বা শস্যের প্রাচুর্য্যের কল্পনা কোরে ছড়া রচনা কোরে গান গাইত, সেটা কর্ম্মশক্তির অনুপ্রেরণার জন্যে, কারণ সে-কল্পনাকে তারা অলীক ভাবত না, সত্য ও বাস্তব ভাবত। আজকের সাম্যবাদী কবিদেরও সেই পথ অনুসরণ করতে হয় বাধ্য হয়ে, কারণ দৃষ্টির সামনে সাম্যবাদী সমাজ নেই, অথচ সেই সমাজের আবির্ভাবের আশ্বাসবাণী চারিদিকে ধ্বনিত হোচ্ছে। পরেশনাথ সান্যাল সেই আশার গানই গান, স্পেণ্ডারের মতো, এবং তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে যে তাঁর প্রতিরূপগুলি সব এ-যুগের, অর্থাৎ যন্ত্রযুগের। এখানেও ডে-লুইস্ ও স্পেণ্ডারের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। যেমন

> বিধাতা কোথায়—মানুষো আজিও দেবতা মানে?
> মাথার উপরে ছড়ানো আকাশে লোহার চাঁদ।
> পেটানো লোহাতে পৃথিবী টেনেছে চরম ইতি
> সবল মানুষ দেবতা চিনে না, লোহারে জানে।
>
> আগুনে তাতানো লাল ইস্পাতে হাতুড়ী ঠুকে
> বিজয়ী মানুষ আগামী দিনের ভূমিকা টানে। (লৌহ-মানব)

ঠিক এই একভাবে ভবিষ্যতে মানুষের মহাতীর্থ গঠনের স্বপ্নে মশগুল্ তরুণ কবি সরোজকুমার দত্ত। প্রাক্তন সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে সাম্যবাদী এমন সব উপাদান শ্রদ্ধার সঙ্গে সংগ্রহ কোরে আত্মসাৎ করবেন যাতে ভবিষ্যতের ভিৎ-গঠনের কাজ সুসম্পন্ন হয়। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা সাম্যবাদীর সাজে না, তার থেকে রস গ্রহণ কোরে নিজেকে পুষ্ট করতে হয় ভবিষ্যতের জন্যে এ-সত্য সরোজকুমার জানেন। তাঁর কবিতায় তাই শুধু অগ্রজদের মঞ্জুল ছন্দের শিঞ্জন শুনিনা, মাত্রা, অক্ষর, স্বর ও ধ্বনি সবকিছুর প্রতি সতর্ক যত্ন নিয়েও তিনি নিজস্ব কঠিন দীপ্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতার সুগম্ভীর ছন্দ শুধু বাংলার প্রাচীন সংস্কৃত-পন্থী কবিদেরই স্মরণ করিয়ে দেয় না, অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি মাইকেলী ভঙ্গী বজায় রেখে স্বকীয়তার প্রমাণ দিয়েছেন। শব্দগুলি তাঁর যেমন কাঠিন্যে উজ্জ্বল, তেমনি নিবিড় আবেগে কম্পমান, তাদের সম্মিলিত স্বর দৃপ্তকণ্ঠের ঘোষণার মতো শোনা যায়। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথাতেই আরম্ভ করা ভাল—

আমার কবিতা কভু কহিবেনা আমার কাহিনী,
অসতর্ক কোন ছত্রে ধ্বনিবেনা ক্রন্দন আমার,
আমার কবিতা নহে দুর্ব্বলের দুঃখের বেসাতি,
নহে সে অপূর্ণকাম অক্ষমের মর্ম্মব্যভিচার।
এ নহে সমষ্টিপ্রেম স্বার্থপর স্বতন্ত্রবাদীর,
আনিনি শক্তির পায়ে অশক্তের শঙ্কিত প্রণামী,
গণগগনের পথে অগ্নিরথ মনমানবের,
যাহারা টানিয়া আনে, তাহাদের সহকর্মী আমি।
আমার পাবেনা দেখা আমার কাব্যের পৃষ্ঠপটে,
সেথায় আমার সীমা অসংখ্যের অসীমে বিলীন,—
বিষপঙ্কে তন্দ্রাহত রুদ্ধস্রোত শৈবাল দিঘীরে,
বাহিরের বন্যাজলে করিয়াছি দিকচিহ্নহীন।
কবরে প্রেতিনী হ'য়ে কাঁদিবেনা আমার বেদনা,
দুঃসাহসী বিন্দু আমি, বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা।

(সরোজকুমার দত্ত)

—দুঃসাহসী' বিন্দু হয়ে যিনি বুকে সিন্ধুর চেতনা বহেন, প্রেতিনী হয়ে যাঁর বেদনা কোনোদিন আমাদের কান্না শোনাবে না, তাঁর যে বিশ্বাস টলটলায়মান নয় তা নিয়ে তর্ক করা চলে না। কবির বিশ্বাসই কবির 'অস্ত্র', তা নিয়ে বিদ্রূপ করা অশোভন। বিদ্রূপ তখনই আমরা করতে পারি, যখন ম্যাথু আর্নল্ড-এর ভাষায় যে-জীবন নিয়ে তিনি সমালোচনা করেন, সেই জীবনের উপর বমনকাতর অশ্রদ্ধা বিশ্বাসের মুখোস পরে' জীবনের সত্যকে মুখ ভ্যাঙচায়। জীবনের বেদী যাঁর ইস্পাত দিয়ে গড়া, তিনি যে বর্ত্তমান সভ্যতার মৃত্যুর দেয়ালি-উৎসব, বিজ্ঞানের ব্যভিচার নির্ম্মমভাবে ঘৃণা করবেন, এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়ে প্রাণের শ্যামল স্ফূর্ত্তির জয়গান গাইবেন, এও স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সভ্যতার ইমারত ধ্বংসে পড়াটাই তাঁর কাছে একমাত্র বা পূর্ণ সত্য নয়, পাশাপাশি যে বৃহৎ ইমারত গঠনের জন্যে সংগ্রামরত বৃহত্তম মানব-গোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ হাতুড়ির শব্দ হোচ্ছে, সেইটাই তাঁর কাছে বৃহত্তর সত্য। খণ্ড সত্য নিয়ে আত্মতৃপ্তি তাঁর অন্তর-বিরুদ্ধ।

মহাকাল মন্দিরের কাঁপিছে পাষাণ ভিৎ
বিভীষিকা-বিগ্রহের অবলুপ্তি হ'বে,—
মুমূর্ষু ও নির্লিঙ্গের মৃত্যু আর লিঙ্গপূজা
হে সভ্যতা, সাঙ্গ করো তবে।

(সরোজকুমার দত্ত)

এইখানেই শেষ করলাম। 'কানা মামা'-রা ক্রুদ্ধ হবেন হয়তো, কারণ 'নিঃসন্দিগ্ধ সাম্যবাদী' কবি সত্যই যাঁরা তাঁদের খানিকটা অন্তত চেনবার সুযোগ পাঠক পাবেন আশা করি। ব্যক্তিগত অভিরুচিটা সাহিত্য-বিচার সভায় এতদিন সম্মানিত হোলেও, সে-সম্মানের আশা কোরে এ-আলোচনা করা হয়নি। যেহেতু কাব্য প্রবহমাণ, কারণ জীবন ও সমাজ প্রবহমাণ, তাই সমালোচনাও এখানে পূর্ণচ্ছেদ টানল না, ভবিষ্যতে প্রসারণের আশা তার রইল।

"ভারতীয় সংস্কৃতির" বেদী

ওম্ মণ্ডলী, সৎসঙ্গ, আর্য্যসংঘ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সুগম্ভীর স্তোত্র-পাঠের ধ্বনিতে যে-ভারতবর্ষের আকাশবাতাস আজও মুখরিত, আদিম মানুষের লিঙ্গ-প্রতীক পূজার প্রাণময় দিকটিকে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণহীন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের জালে জড়িয়ে যে-দেশের সমাজের সভ্যশ্রেণী আজও লিঙ্গ-প্রতীকোপাসনা কোরে থাকেন, যে-দেশের কর্ম্মঠ যুবকেরা ব্রহ্মচারী সেজে গৈরিক বসন পরিধান কোরে বৈষ্ণব বোলে পরিচয় দিতে আজও লজ্জিত হন না, আশ্রম-আকীর্ণ সেই ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও সভ্যশ্রেণী তাঁদের এই 'আর্য্যভূমিকে', তাঁদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যে বিশ্ব-সভ্যতার উৎস বোলে খোলকরতালের শব্দে দিকে দিকে প্রচার করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। অতীতের হত্যাকারীর জীবনের ভয়ে সাধুর ছদ্মবেশে যে-দেশের মৌনী ও মুখর 'বাবারা' ধূপধুনার ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্যে উপবেশন কোরে রাতারাতি চতুঃপার্শ্বের সভ্য নরনারীদের ভক্তবৃন্দে রূপান্তরিত করতে পারেন, যে-দেশের শীলমোহর-করা খুনীরা নিজেদের রক্তরঞ্জিত দেহ কর্দ্দমাক্ত গঙ্গার খালে ধৌত কোরে পুনরায় তাঁদের বনেদী দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা করেন, সে-দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যে জন্মগত কুসংস্কারগুলিকেই স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে যথেষ্ট সম্বল মনে করবেন তাও আদৌ অস্বাভাবিক নয়। যন্ত্রের চিন্তা যে-দেশে আজও মৃত্যুযন্ত্রণার উদ্রেক করে, এবং বিজ্ঞানের নামে যেখানকার অধিবাসীরা আজও অজ্ঞান হয়ে যায় আতঙ্কে, সেখানে যে কোনোরকম বৈজ্ঞানিক সুচিন্তা বা যুক্তি বর্দ্ধিত হোতে পারে না, এও অত্যন্ত সহজ সত্য কথা। অতএব আর্য্য-সভ্যতা বা হিন্দু-সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতা তথা বিশ্ব-সভ্যতার বেদী বলতে এখানকার পণ্ডিতকুলের কোনো সঙ্কোচ নেই, এবং সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের নামে তাঁদের সংস্কার-জর্জ্জরিত স্নায়ুতে স্নায়ুতে শিহরণ তো জাগেই, উপরন্তু শাস্ত্র আর 'সংহিতা' খুলে তাকে খণ্ডন করতেও তাঁদের

পাণ্ডিত্যে বাধে না। আর সাহিত্য বা শিল্পকলার বস্তুনিষ্ঠায় তাঁদের চক্ষু ব্রহ্মতালুতে ওঠে, দেবতার মহিমাকীর্ত্তন পরিত্যাগ কোরে এল বোলে তাঁরা তাকে বর্ব্বর শিল্প, বর্ব্বর সাহিত্য বোলে অভিশাপ দেন, এবং শূন্যমার্গ ছেড়ে তারা জনগণের মধ্যে মাটিতে নামল বোলে তাঁদের উদ্ধত মন নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জে' ওঠে। বস্তুনিষ্ঠা, সংঘ-আবেগ, সংঘ-প্রেরণা, গণসাহিত্য প্রভৃতির উল্লেখেই তাঁরা ঘোরতর আপত্তি জানান, কারণ সাহিত্যের জন্মভূমি বিশুদ্ধ মনের শূন্যতায়, বিশেষ কোরে ভারতীয় সাহিত্য বা ভারতীয় সংস্কৃতির বেদী নাকি বৈরাগ্য ও ঐশী সাধনার দার্শনিক স্তরে। ভারতবর্ষকে এইভাবে বিশ্ব-সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে দেখবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আঙুল দিয়ে শাস্ত্র দেখিয়ে দেন, আর না হয় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা উল্লিখিত কোনো ঢাকা শহর-নিবাসীর মতো বলেন 'সবই ব্যাদে আছে।' * মানব-সংস্কৃতির মূল প্রাণধারাতে যে ভারতবর্ষেরও যথেষ্ট দান আছে, এবং একদিন যেমন মানুষ সংঘ ও গোষ্ঠী-জীবনের সারল্য ও সাম্যের স্ফূর্ত্তির মধ্যে, নৃত্য, গীত, কবিতাকে আনন্দের ও কর্ম্মের সুন্দর প্রকাশ, অর্থাৎ শিল্প বোলে বরণ করেছিল, শিল্প ও সংস্কৃতির বেদী গঠন করেছিল, তেমনি তাদেরই মতো করেছিল ভারতবর্ষের মানুষ,—প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাগার্য্য ভারতবর্ষের গুহা-শিল্পে, নৃত্যে, ছড়ায়, গানে, মৃৎশিল্পে ও আলপনায় যার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। সেখানে বিশ্বের মানবিক সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক পার্থক্য নেই, এবং সংস্কৃতির 'বেদী' মানবিক, যার মধ্যে প্রাণের ও কর্ম্মের সাবলীল স্ফূর্ত্তিই হোচ্ছে একমাত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং 'ভারতীয় সংস্কৃতির বেদী' কথাটাই শব্দের অপপ্রয়োগ, কারণ বৈশিষ্ট্য আর্য্য-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, হিন্দু-সংস্কৃতি, ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির বনিয়াদ গঠনে যেখানে বিশ্ব-মানবের প্রত্যক্ষ প্রয়াসের চিহ্ন রয়েছে সেখান থেকে ভারতবর্ষও বাদ যায়নি, কারণ ভারতের মানুষেরাও মানুষ। শ্রেণী বা সম্পত্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী সেই মানব-সংস্কৃতি

---

* আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা—'ভারতবর্ষ' ফাল্গুন ১৩৪৭। এই প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅনিলবরণ রায় ও অধ্যাপক সাহার যুক্তিতর্কগুলি পঠিতব্য।

যেমন বাইরের প্রসাধনের সামগ্রী আহরণ কোরে প্রাণের অন্তঃস্রোতের স্বাভাবিকতা ক্রমে ক্রমে নিয়মিত ও পরিমিত করেছে, তেমনি ভারতের সংস্কৃতিও করেছে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হোচ্ছে মানব-সংস্কৃতির সেই বেদীর পরিচয় দিয়ে ভারতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য উল্লেখ করা, এবং পরোক্ষে প্রমাণ করা যে ভারতবর্ষও ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক নিয়মে বিশ্ব-সাম্যবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সেই কারণে 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'র সংস্কৃতি-বাগীশরা একে সরাসরি অবজ্ঞাভরে বর্জ্জন করতে পারেন। আর প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে যেটুকু প্রমাণ করা যায় তা এখানে প্রারম্ভে উল্লিখিত হোলেও, বিশেষজ্ঞেরা তাতে বিরক্ত বৈ লাভবান হবেন না, কারণ ঐ বিষয়ে কতকটা আমি যে আদার ব্যাপারী তাতে ভুল নেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে নৃবিজ্ঞানীরা অনেক দিক থেকে বিচার করেছেন, তার মধ্যে সমস্ত মতামতগুলির চয়ন এখানে সম্ভব নয়। বিখ্যাত নৃবৈজ্ঞানিক ডাঃ মণ্টানাডন্ কতকগুলি 'সাংস্কৃতিক চক্রে' বা Cultural Cycles-এ ভাগ করেছেন। প্রথম চক্রটির প্রমাণ তাস্‌মেনিয়াতে পাওয়া যায়, এবং প্রাথমিক পুরোপলীয় (Palaeolithic) যুগের সমস্ত নিদর্শনগুলি তৎকালীন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। মৃৎশিল্প, কৃষি, বস্ত্র বা কুটীর প্রভৃতির কোনো চিহ্ন তখনো পাওয়া যায়নি, শুধু রুক্ষভাবে কাটা পাথর, কাঠ ও পাথরের অস্ত্র, কুঠারাকৃতির লাঠি, খননের লাঠি, আদিম পান্‌সি, পাতার ছাউনির আশ্রয় ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এ-স্তরের বা চক্রের ভারতীয় পরিচয় সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানী পঞ্চানন মিত্র বলেন যে আন্দামানে এখনো এই স্তরের সংস্কৃতি-চিহ্ন আছে। দ্বিতীয় চক্রটিকে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে দেখা যায়, এবং তার বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে প্রাথমিক নবোপলীয় সংস্কৃতির উপকরণগুলি, যেমন বুমারাং, মৎস্যশীকারের বড়শী, ঝুড়ি প্রভৃতি। পঞ্চানন মিত্র মহাশয় বলেন যে দাক্ষিণাত্যে এখনো এই স্তরের কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অবশিষ্ট পাওয়া যেতে পারে। তৃতীয় চক্র হোচ্ছে টোটেম-চক্র, যার নিদর্শন উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায়, পশ্চিম নিউগিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়, এবং কনিক্-আকৃতির কুটির, ছোট কাঠের চাল, বাঁশি, ট্রাম্পেট প্রভৃতি যে-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে ছোটনাগপুরের ইন্দো-অষ্ট্রেলীয়

ট্র্যাক্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চতুর্থ চক্রের প্রমাণ আছে উত্তর-পূর্ব্ব অষ্ট্রেলিয়ায়, পূর্ব্ব-মেলানেসিয়া, পূর্ব্ব-নিউগিনি প্রভৃতি অঞ্চলে। এই সময় কৃষির উৎপত্তি ও মুখোসের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে যে-সংস্কৃতির চিহ্ন আজও সিংহলীদের মধ্যে রয়েছে। পঞ্চম চক্রে তীর-ধনুকের যুদ্ধ মেলানেসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় দেখা যায়, উত্তর ভারতে সভ্যতার প্রাথমিক যুগের সঙ্গে এবং ভারতবর্ষের আদিম জাতগুলির সঙ্গে যার সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চানন মিত্র মহাশয় বলেন যে এইভাবে দেখা যায় যে প্রাথমিক মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্য এমন কথা বলা যায় না যে সেই সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ঢেউ ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়েছে, কিন্তু এটা ঠিক যে তাদের অনেকগুলির প্রভাব এই বিরাট দেশের মানুষের উপর পড়েছে।*

এ-ছাড়া আর্য্য-সভ্যতাকে বিশ্ব-সভ্যতার উৎস এবং ভারতীয় সভ্যতার আদি বোলে যাঁরা তার জন্ম-তারিখ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ সাল পর্য্যন্ত নির্ণয় করেন, তাঁরা যেন বিস্মৃত না হন যে ঐ সময় পৃথিবীর অনেক স্থানেই বহু উল্লেখযোগ্য সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে আজ মিশরীয় সভ্যতাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২০০ সাল পর্য্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া যায়, এবং প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭০০ সালেই যদি মিশরের বিখ্যাত পিরামিড নির্ম্মিত হয়ে থাকে তাহোলে ভারতীয় সভ্যতার উক্ত বিশেষজ্ঞদের অহংকার করবার মতো কিছু থাকে না। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬০০ সালে সুমেরীয় সভ্যতার উৎকর্ষের কথাও আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কৃপায় অনেকেই জানেন। তাছাড়া ১৯২২ সালে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার কোরে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব কথাকে ভিত্তিহীন গুজব বোলে প্রমাণ করেছেন। যাঁরা প্রচার করেন যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আরম্ভ আর্য্য বিজেতাদের

*Thus we find India is intimately associated with every phase of early human culture. We cannot indeed be very positive in asserting that all the earlier ethnic and cultural waves passed via India, but we see how many of them have left their impress on the motley population of the varied and vast continent. (*Pre-historic India*—By Panchanan Mitra—Second Edition 1927—P. 432.)

সঙ্গে, তাঁদের নীরব থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। অবশ্য সিন্ধু-সভ্যতার কাল-নির্ণয় এখনো ঠিক হয়নি। যে সিলমোহরগুলি পাওয়া গিয়েছে তাদের দেখে মিঃ ফ্রাংকফোর্ট বলেন যে সেগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৫০-২৫০০ সালের মধ্যে হবে[১]। ডাঃ হেল্‌মুথ্‌ টেরা প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০ সাল পর্য্যন্ত একে টেনে নিয়ে যেতে চান, এবং তাঁর যুক্তি বিশেষ কিছু না থাকলেও তিনি বলেন যে সভ্যতার যা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দেখলে বোঝা যায় সে-সভ্যতা গড়তে অন্তত ৫০০ থেকে ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লেগেছে।[২] অনেকে বলেন সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার অনুজ, এবং সিন্ধু-সভ্যতা সুসার সমসাময়িক, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ থেকে ৪০০০ সালের মধ্যবর্ত্তী। তারিখের একটুআধটু আগুপিছু স্বীকার কোরেও নিরাপদে বলা যেতে পারে যে অর্দ্ধ-সভ্য যাযাবর আর্য্যেরাই সিন্ধু-সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল, কারণ মহেঞ্জো-দড়ো বা হারাপ্পার পতন নিশ্চয়ই কোনো ভৌতিক কারণে ঘটেনি। আর্য্যেরাই প্রচার করেছিল যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার সময় এক কৃষ্ণকায় অসুর ও দস্যুদের সঙ্গে তাদের ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। এই দস্যুরা যদিও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগরে বসবাস করত এবং শিল্পকলায় তাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল তবু তাদের অশ্লীল পূজা-পদ্ধতির জন্যে আর্য্যেরা তাদের ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই সব গল্প সর্ব্বৈব মিথ্যা বোলে প্রমাণিত হয়েছে, যে-ধরণের মিথ্যা আজ আর্য্যদের বংশধর জার্ম্মান্‌ নাৎসীদেরই প্রচার করা শোভা পায়। কারণ যারা আম্রি, হারাপ্পা, মহেঞ্জো-দড়ো, চান্‌হু-দড়ো, ঝুকুর প্রভৃতি নগরের ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং আজ যাদের সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ মিলিয়ে কয়েকটা খেলার তলোয়ার বা সড়কি ভিন্ন অন্যকিছু মরণাস্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে না, তারা যে সত্যই শান্তিপ্রিয় ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং যাদের বাঁচবার জন্যে বা আত্মরক্ষার জন্যে দুর্গ বসানোর, পরিখা কাটার বা প্রাচীর তোলার প্রয়োজন হয়নি, তারা যে কোনো

১ "The Indus Civilization and the Near East"—By H. Frankfort—*Ann. Bill. of Ind. for the year 1932* Leyden, 1934. P. P. I—12.

২ "Stone Age Man in Ice Age India and Burma,"—By Dr. Helmuth de Terra—*Asia*, July 1937, P. P. 501—506.

সাম্রাজ্যলোভী শাসকের শাসন মানেনি তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য প্রকৃত সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসন-পদ্ধতি জানবার উপায় নেই যতদিন না অগণিত সিলমোহরগুলির লেখা ব্যাখ্যা করা হোচ্ছে, কিন্তু তবু মোটামুটি সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত তাদের সাধারণ জীবন-যাত্রা থেকে নিশ্চয় মেলে। আর সে-সভ্যতা প্রাগার্য্যদেরই কীর্ত্তি ১ বোলে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন প্রাগার্য্য যদি 'অনার্য্য' হয় তাহোলে আর্য্যত্বের গৌরবে অনার্য্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাও ধৃষ্টতা মনে হয়। আবার প্রতীকের সাহায্যেও এই প্রাগার্য্যদের বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। মহেঞ্জোদড়োতে পাঁচটি সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে, প্রত্যেকটির উপর দু'টি সিংহের সঙ্গে সংগ্রাম-রত একটি দণ্ডায়মান উলঙ্গ মানুষ অঙ্কিত আছে। একটি অনেক পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল, বাকি চারটি ম্যাকে সাহেব সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।২ সিলমোহরের উপর গাছ, বাঘ, হাতি, প্রভৃতির মূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে। তা ছাড়া নৃত্যরতা মেয়েদের এবং লিঙ্গের 'প্রতীক'ও আছে। এই প্রতীক-গুলির ব্যাখ্যা যেভাবেই করা হোক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই একই 'প্রতীক' পৃথিবীর যে-জাতের মানুষেরা শিল্প বা

১ মহেঞ্জোদড়োর আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র বলেছেন: "That this great civilisation which is now being revealed was no mere provincial offshoot of Mesopotamian culture, but was developed for countless generations on the banks of the Indus itself and its tributaries, is becoming more and more manifest as the excavations advance. Who the people were who evolved it is still an open question, but *the most reasonable view seems to be that they were the pre-Aryan (probably the Dravidian) people of India known in the Vedas as the Dasyus or Asuras*, whose culture was largely overwhelmed in the second or third millenium B. C. by the invading Aryans from the north, just as the old Aegean culture of the Mediterranean (which in some respects bears a striking resemblance to this culture of the Indus) was largely overwhelmed by the invading Achaeans."—*Pre- historic India.* P. 272. Italics আমার।

২ Mackay, *Further Excavations*, I, P. P. 337, 657; Seals nos. 75,86, 122,454. See also *Arch. Survey of India, Ann. Report* 1930-34, vol I, P. 63; vol II, plate XXIII. I.

সিলমোহরে প্রকাশ করেছে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তৎকালীন ভারত-বাসীদের অর্থাৎ প্রাগার্য্যদের জীবনের অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিকেরা বলেন যে এই প্রতীকগুলির পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ তেমন রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি, এবং সংঘজীবন বা গোষ্ঠীজীবনই তাদের সমাজের ভিত্তি ছিল। অর্থাৎ আদিম সংঘ-সমাজের এইগুলি হোচ্ছে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রাগার্য্য বা অনার্য্যদের জীবনযাত্রা বা সমাজ-জীবনকে একরকম সংঘভাব বা গোষ্ঠীভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলা যেতে পারে। অবশ্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মত মেনে নিলে প্রাগার্য্যদের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাত বোলে অভিহিত করতে হয়।[১] অস্ট্রিকরা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করত, পাহাড়ের গা কেটে ধান ক্ষেত প্রস্তুত করত, সমতল জমিও চষত। পৃথিবীর অন্যান্য আদিম জাতির মতো এরাও বিশ্বাস করত যে মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা গাছে, পাহাড়ে বা জীবজন্তুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই অস্ট্রিকদেরই বংশধর হোচ্ছে আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কুর্‌কু, ভূমিজ, শবর, গদব, ভীল প্রভৃতি। দ্রাবিড়দের বৈশিষ্ট্য ছিল সংঘশক্তি, এবং প্রধানত নগরকে অবলম্বন কোরে তাদের সভ্যতা গড়ে' ওঠে। মহেঞ্জো-দড়ো ও হারাপ্পার বিরাট নগরগুলিকে সুনীতিবাবু দ্রাবিড়দের কীর্ত্তি বোলেই মনে করেন। দ্রাবিড়রা যব ও গমের চাষ করত, গোপালনও করত। তারা কর্ম্মঠ ও কৃতকর্ম্মা ছিল, এবং তাদের জীবনযাত্রা একটু উন্নত হোলেও, অস্ট্রিকদের সঙ্গে তাদের যে তেমন বিরোধ ছিল না তা ছোটনাগপুরে দ্রাবিড়-জাতীয় ওরাও ও অস্ট্রিক-জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান থেকে বোঝা যায়।

আর্য্য-সভ্যতার আবির্ভাবের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা এইখানেই শেষ করা যেতে পারে, কারণ তার বিশ্ব-সভ্যতার মাতৃত্বের দাবীর শূন্যগর্ভতা প্রমাণের জন্যে এই প্রবন্ধে এর চাইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবকাশ আছে বোলে মনে করি না। আর প্রাগার্য্য বা অনার্য্যদের জীবনযাত্রার মোটামুটি যেটুকু ধারণা করা গিয়েছে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বা ২৫০০ সালের যতো পশ্চাতেই

---

১ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—(১৩—২১)।

তাকে বিস্তৃত করি না কেন, আদিম শান্তিপ্রিয় মানুষের সংঘভাব বা গোষ্ঠী-জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনের সাদৃশ্য সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধের কারণ নেই, এবং আমার মূল বক্তব্য বিষয়ের জন্যে সেইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হয়তো আরও বহু প্রতীয়মান রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবেন, কিন্তু এখন এইটুকু সম্বল কোরে ভারতবর্ষের শিল্পকলা, নৃত্যগীত প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করতে কোনো বাধা নেই। সঙ্ঘভাবাপন্ন কর্ম্মময় জীবনের অনুপ্রেরণায়, পারস্পরিক সাম্য ও সৌসাদৃশ্যের প্রাণময় স্ফূর্ত্তিতে একদিন মানব-সংস্কৃতির যে বেদী পৃথিবীতে গঠিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের গুহাশিল্পে, আলপনায়, মৃৎশিল্পে, নৃত্যে, গীতে, ছড়ায় ও ব্রতকথায় তারই অমলিন পরিচয় রয়ে গিয়েছে। মানব-সংস্কৃতির সেই শৈশবের দিকে একবার চেয়ে দেখে, আসল আলোচনার দিকে অগ্রসর হই।

মানুষ তার মানসিক শক্তি বহিঃপ্রয়োগের অবকাশ পায় বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে নিজে সংস্পর্শে এসে। অস্ত্র গড়বার পর প্রকৃতির উপর মানুষের আত্মশক্তির বোধ জন্মাল, এবং সেই বোধ থেকে হোলো আদিম সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্ম। আদিম জীবনের কোনো একটি চিত্র পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হোত নৃত্যের ছন্দের মধ্যে। যেমন শীকার। শীকারের পূর্ণরূপ, অর্থাৎ যাবতীয় বিপদ-আপদ-ভয়ডর-বর্জ্জিত 'আদর্শ শীকার' নৃত্যের ছন্দে প্রাণবন্ত হয়ে প্রস্ফুটিত হোত। ছন্দে হোলো জীবনের প্রকাশ, সংস্কৃতির জন্ম, কারণ কর্ম্ম ছন্দোময়, এবং ছন্দ কর্ম্মময়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধও স্থাপিত হোলো—প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন ছাড়িয়ে দূরের ইঙ্গিত তাতে থাকবে, পূর্ণতর ও বাস্তবতর জীবনের সঙ্কেত, অথচ প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের প্রতি সে শ্রদ্ধাপরায়ণ।* অর্থাৎ বাস্তবের মাটিতে শিল্পের যে-শতদল ফুটে উঠবে তাতে শুধু তার মূলাশ্রয় মাটিরই গন্ধ থাকবে না, দূরের মাটির গন্ধ সে বহন কোরে আনবে, আরও মিষ্টি, আরও সুন্দর গন্ধ, আরও উর্ব্বর

---

*এ-সম্বন্ধে জ্যাক্ লিণ্ড্সে বলেছেন: "We see in it, then, the structural essence of all creative arts, which always seems more complete than actual life, yet exists four-square on earth." *A Short History of Culture*—By Ja^k Lindsay. P. 41. এই প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তকের 'প্রথম খণ্ড' (The Foundations) পড়া যেতে পারে।

ফলপ্রসূ মাটির। সেইজন্য শিল্পের মধ্যে আমরা যে ‘কল্পনা’ বা ‘ব্যঞ্জনা’র কথা বলি, তার সঙ্গে গোঁড়া সমালোচকদের ‘কল্পনা’ ও ‘ব্যঞ্জনা’র অনেক পার্থক্য আছে। ‘কল্পনার’ অর্থ ‘বৃহত্তর বাস্তব,’ প্রত্যক্ষ বাস্তবের অগ্নিগর্ভ থেকে যে-বাস্তবের আবির্ভাব হয়। তার বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে যে সে ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক বিমূর্ত্ত বাস্তব নয়।

শান্তিময় সংঘজীবনের প্রেরণায় প্রাচুর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎসব করত মানুষ নৃত্যের ছন্দে, শ্রমের অনুকরণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তালে তালে আন্দোলিত ও তরঙ্গায়িত কোরে। শব্দের ঘাতপ্রতিঘাতেও আদিম কাব্য বা সঙ্গীতের মধ্যে সেই শ্রম-প্রেরণা সন্ধান করা হোত। অস্ত্র গঠন কোরে প্রাকৃতিক শক্তির উপর কিছুটা প্রভুত্ব বিস্তার কোরে মানুষ দেখল সে-শক্তির অনেক-কিছুই এখনো তার কাছে অপরিচিত। আয়ত্ত শক্তির সাহায্যে সেই প্রাকৃতিক শক্তির সমগ্রতাকে উপলব্ধি করবার জন্যে মানুষ নিজেকে অভিক্ষেপ করল, এবং এই অভিক্ষেপ থেকে হোলো জাদুর জন্ম। বৃক্ষ থেকে ফল হয়, সেই ফুল মাটিতে ঝরে’ পড়ে যায়, আবার অংকুরিত হয়, সুতরাং বৃক্ষ হোলো জীবনের ‘প্রতীক’, বৃক্ষের আত্মা ও জীবনে বিশ্বাস জন্মাল। আর পাথর কেটে যখন অস্ত্র তৈরী হয়, এবং সেই অস্ত্র ফসল ফলায় জীবনের জন্যে, তখন তাকেও বন্দনা করতে হবে বৈ কি। পাথরের অস্ত্রও হোলো জীবনের প্রতীক। তারপর এই প্রস্তর যুগ থেকে যখন ধাতুর যুগে মানুষ নিজেরই চেষ্টায় পৌঁছল, তখন কৃষিকার্য্যের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানুষ বুঝ্‌লো যে আগামী দিনের শস্যোদ্গমের জন্যে সঞ্চিত বীজের প্রয়োজন, এবং শস্যের এই পুনর্জন্ম থেকে পুনর্জীবনের (Resurrection) ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হোলো। ধর্ম্ম অংকুরিত হোলো, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে একমাত্র জীবন ও জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র কোরে। এইভাবে প্রস্তর যুগ থেকে ধাতুযুগে পদার্পণ কোরে মানুষ সংস্কৃতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করল।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমত, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষ শুধু প্রকৃতিকেই পরিবর্ত্তন করছে না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিবর্ত্তিত হোচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্ত্তনের মূলে রয়েছে তার আয়ত্ত শ্রমের

অস্ত্র, যে-অস্ত্র ব্যবহার কোরে সে ফসল ফলিয়ে, শীকার কোরে তার জীবন ধারণ করে, এবং যে-অস্ত্রের শক্তির সাহায্যে সে আরও শক্তিমান অস্ত্র গড়তে শেখে, গতিশীল জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত থেকে। তৃতীয়ত, তার শিল্পকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, জাদু, ধর্ম্ম, অর্থাৎ তার 'সংস্কৃতি' সবই এই শ্রমের অস্ত্র, এই জীবিকা উৎপাদনের অস্ত্র এবং শ্রমের আনন্দ ও সংঘপ্রেরণাকে কেন্দ্র কোরে সৃষ্ট হয়েছে। সেইজন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির নামকরণ হোত সর্ব্বসাধারণের শ্রমের অস্ত্র দিয়ে, যেমন প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি। শ্রেণী-সমাজের বৈষম্য যখন বিকট হোতে থাকল, তখন ঐতিহাসিকেরা এই সত্য নামকরণ পরিত্যাগ কোরে শ্রেণী ও জাতের নামানুকরণে সংস্কৃতির নাম দিলেন। কার্ল মার্কস্ এই কথাটিও সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।*

উৎপাদনের অস্ত্র হাতে কোরে মানুষ প্রকৃতিকে শক্তি প্রতিযোগিতায় আহ্বান করল। জীবনের সহজ গতির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের প্রাচুর্য্য আবশ্যক, সেই আবশ্যকতাই হোচ্ছে এই আহ্বানের কারণ। সংগ্রামে শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু শক্তির বিকাশ স্বাধীনতায়, সাম্যে ও সংঘভাবে। সুতরাং জীবনে ছন্দের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই, এবং নৃত্যই জীবনের ছন্দ। কর্ম্ম জীবনের ছন্দ। কর্ম্মজীবনের অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটাল শিল্পী মানুষ, সংঘ-নৃত্যে সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মিলিত ছন্দে। সেইভাবে উৎসারিত হোলো সঙ্গীত, আদিম কাব্য। তারপর চিত্রলিখন ও গুহাঙ্কন, মৃৎশিল্প প্রভৃতির মধ্যে এই জীবন উৎসবের, সংঘ-নৃত্যের, সরল সহজ রেখা ও বৃত্তের, জন্তু জানোয়ারের, বৃক্ষের ছবি ও দৃশ্য ফুটে উঠল। সংস্কৃতির বনিয়াদ গঠিত

* "Though historians have hitherto been little inclined to pay attention to the development of material production, which is the basis of all social life, and therefore of all real history, pre-historic times have always been classified in accordance with the results, not of so-called historical investigations, but of scientific investigations. They have been classified in accordance with the materials from which tools and weapons were made. That is why we speak of the stone age, the bronze age, and the iron age." (Capital. vol I. Chap. V. P. 172. *footnote*—Everyman's Edition.)

হোলো কর্ম্মের ও কর্ম্মোৎসবের সম্মিলিত আনন্দবোধ ও আনন্দপ্রকাশ থেকে, যার বাণী হোলো সুন্দরতর জীবনের কামনা, আর গতিশীলতা। ভারতবর্ষও একদিন সেই বনিয়াদ-গঠনে হাত মিলিয়েছিল।

প্রথম অঙ্কনের বিচার করা যাক। অঙ্কন বিচারের পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। সরল রেখা বা বৃত্তাঙ্কনের ধারণা মানুষের কোথা থেকে এল। বৃত্ত ও সরলরেখাই হোচ্ছে চিত্রের আঙ্গিকের ভিত্তি। মানুষের জৈবিক প্রক্রিয়ার বৃত্তাকার অনুভূতির সঙ্গে সামাজিক শক্তির সংঘর্ষে এই সরলরেখা ও বৃত্তের প্রত্যয় মানুষের মনে জাগে। নারীর গর্ভযন্ত্রনা কম্বুরেখায় শরীরের মধ্যে ওঠা-নামা করে, নৃত্যের ছন্দও বৃত্তাকার। সুতরাং বৃত্ত ও সরলরেখার প্রত্যয় প্রথম মানুষের মনে জাগল, এবং তার সাহায্যেই চিত্রাঙ্কণ সম্ভব হোলো।[১] এখানেও জীবনের সঙ্গে প্রাথমিক অঙ্কনের এবং তার আঙ্গিকের যোগাযোগ দেখতে পাই। ঈজিপ্ট, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলের মৃৎপাত্রের উপরের রেখাঙ্কন ও বৃত্তাঙ্কন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চানন মিত্র মহাশয় মহেঞ্জো-দড়োর মৃৎশিল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে পাত্রের উপরের অঙ্কন বাংলাদেশের আল্‌পনার সঙ্গে তুলনা করা চলে।[২] শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-দেশের, বিশেষ কোরে বাংলাদেশের আল্‌পনা শিল্প সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের বাসনা-কামনার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তিনিও অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর 'বাংলার ব্রত' নামক পুস্তকের 'নিবেদন'-এর মধ্যে নিজস্ব সুন্দর ভঙ্গীতে বলেছেন, "হয়তো সাধারণে পাকা হাতের টানা আল্‌পনাগুলিই ভালো বলে ভুল করবেন এবং ভয় হয়, হয়তো বইখানি

---

১ "The circle and the line are the concepts of movement. That is why we learn at school in our geometry lessons that they don't exist in nature in their pure form. The pure form is not a gift from nowhere. It is a concept of movement derived from the tension of biological and social forces in the individual."—*A Short History of Culture*—By Jack Lindsay P. 79.

২ "The white filled-in designs are still the dominant notes in the painted miniature ritual potteries of Bengal and its 'alpana' designs."—*Pre-historic India*, By Panchanan Mitra. P. 407.

পল্লিগ্রামের কোনো একটি ছোট মেয়েকে একটু ধরে-ধরে আল্‌পনা দেবার চেষ্টা করাতেও পারে; সেইজন্য বলে রাখা দরকার আল্‌পনার সচল রেখা অচল হয়ে পড়বে যদি সেগুলিকে রুল কম্পাস কিম্বা সুতো ধরে আঁকার চেষ্টা হয়। বিনা চেষ্টায় হাত থেকে বেরিয়েছে, আল্‌পনার এটা একটা গুণ, দোষ নয়—'Lines suggest movement and it suggests best when the fluctuations are not mathematically accurate'—হাতের লেখা চিঠিখানি আর ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র দুয়ে যতটা প্রভেদ, ধরে চিত্র করা আর নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে আল্‌পনা দিয়ে যাওয়ায় ততখানি ভিন্নতা।"১

আল্‌পনার শিল্প হোচ্ছে সমতল ভিত্তিকে চিত্রণ, এবং যা আঁকা হবে তার পরিষ্কার সহজ রূপটি প্রকাশ করা। বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এই আল্‌পনা শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেলেও, বাংলাদেশেই এই শিল্পের বিকাশ ও চর্চ্চা বেশী হয়েছিল, এখনো গ্রামে হয়ে থাকে। বাংলার আল্‌পনার বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে লতামণ্ডন, আর মান্দ্রাজের দড়ির ফাঁস এবং বিন্দুই আল্‌পনা চিত্রের ভিত্তি। প্রকৃতির মধ্যে যেসব লতাপাতা, তাকেই ভিত্তি কোরে আল্‌পনা-চিত্রের ভিত্তি। প্রকৃতির মধ্যে যেসব লতাপাতা, তাকেই ভিত্তি কোরে আল্‌পনার কলালতা, কল্‌মী লতা, খুন্তীলতা, চাল্‌তালতা, চাঁপালতা, শঙ্খলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। শঙ্খের প্যাঁচগুলি প্রাচীন গ্রীস ও ক্রীটদেশেরও একটি উল্লেখযোগ্য মণ্ডন। ঈজিপ্তেও এই লতামণ্ডনের দর্শন মেলে। এই লতামণ্ডন ছাড়াও আরও অনেকরকমের আল্‌পনা আছে, এবং সেগুলিকে এইভাবে ভাগ করা চলে—প্রথম—পদ্মগুলি।

১ বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৌতূহলী পাঠক অবনীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বহু যত্নে সংগৃহীত আল্‌পনা চিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের সমালোচনা মিলিয়ে পড়লে লাভবান হবেন, এবং সমালোচনার রীতিতে বিস্মিত হবেন। শিল্প-সমালোচনায় এই শ্রেণীর বই বাংলায় দ্বিতীয় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবনীন্দ্রনাথের এই পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার-এর "ঠানদিদির থলে বা বাঙ্গালার ব্রতকথা" থেকে আমি এই প্রবন্ধে এ-দেশের ব্রত কথাগুলি সংগ্রহ করেছি। এ-ভিন্ন আর অন্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংকলন আমি পাইনি।

দ্বিতীয়—লতামণ্ডন। তৃতীয়—গাছ, ফুল, পাতা প্রভৃতি। চতুর্থ—নদ, নদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য। পঞ্চম—পশুপাখি, মাছ প্রভৃতি জন্তু। ষষ্ঠ—চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র। সপ্তম—নানা আভরণ। অষ্টম—পিঁড়ি-চিত্র। এই আল্‌পনা চিত্রগুলির মধ্যে একরকম আল্‌পনা আছে যেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রগুলির মধ্যে একরকম আল্‌পনা আছে যেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্ত্তি, প্রায় ঈজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো। আবার আর একরকমের আল্‌পনা আছে যেগুলিকে মোটামুটি মনের মানচিত্র বলা যায়। কিন্তু এই আল্‌পনার চিত্রগুলি সত্যই প্রতিরূপ নয়, শুধু কামনার জিনিষটিকে সেখানে প্রকাশ করা হয়নি। মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে এই সুন্দর হাতের কাজগুলির যোগাযোগ রয়েছে, কিন্তু সেই কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতার মধ্যে যে ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব তারই মধ্যে এই শিল্পের প্রকাশ। আল্‌পনা সেইজন্য শিল্প। তার মধ্যে সেইজন্যই অতো কারুকাজ, অতো রেখার ও বৃত্তের ঘোরপ্যাঁচ। তাহোলে কামনাকে আল্‌পনাগুলি ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে? শূন্যে নয়, অমর্ত্ত্যলোকে নয়। পদ্ম বা লতাপাতার বা পিঁড়ির, বা সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের বা শস্যদেবীর চিত্রে অতো কারিগরির প্রয়োজন কি? কামনা পক্ষ বিস্তার কোরে বৃহত্তর, সুন্দর কামনায় রূপ নিতে চাইছে, বাস্তব কামনাতে তার উৎস রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতর কামনায় বিকাশের প্রয়াসী বোলে তার অতো অন্তরের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নিভৃতে এগুলি সাধনা করা হোচ্ছে না, কামনা ও বাসনা ব্রত-উৎসবের সংঘ আবেগের সঙ্গে এগুলি সহজে প্রকাশিত হোচ্ছে। কোনো শাসন, নিয়ম বা বিবেচনার সঙ্কোচ বা ভয়ডর নেই, অথচ স্বাধীন হয়েও কারও স্বাধীনতাকে আঘাত করছে না, বরং পূর্ণবিকাশে আরও সহায়তা করছে। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ না থাকলে এমনটি কেমন কোরে সম্ভব হয়? সৌসাদৃশ্য বা সাম্য এ ভিন্ন আর কাকে বলে?

এইবার গুহাচিত্রের একটি দৃষ্টান্ত দেব। মধ্যপ্রদেশের রায়গড় পর্ব্বতের গুহাচিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ পার্সি ব্রাউন্ স্বীকার করেছেন যে সেগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্র। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু হোচ্ছে, শীকারের দৃশ্য,

দলবদ্ধ মানুষের মূর্ত্তি, চিত্রলিখন, নৃত্যচিত্র, সরীসৃপ প্রভৃতি। চিত্রের প্রসঙ্গ দেখেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে এগুলি প্রাগার্য্যদের কীর্ত্তি, এবং সংঘজীবনের গোষ্ঠীনৃত্য, শীকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে সুস্পষ্ট। পৃথিবীর বহু আদিম জাতের গুহাচিত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, এবং সে-সাদৃশ্য শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও। চিত্রগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে সাবলীল ও সহজ প্রকাশভঙ্গী, এবং এদিক দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ঈজিপ্তের মৃৎশিল্পের সঙ্গে এর মিল আছে।* রায়গড় পর্ব্বতের কাছাকাছি কোনো স্থানের অধিবাসী আমাদেরই 'অসভ্য' পূর্ব্বপুরুষেরা তাদের কোনো কামনা ও বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্যে, বা কর্ম্মজীবনের কোনো প্রেরণালাভের জন্যে আজ থেকে হাজর হাজার বছর আগে এই নৃত্য, শীকার ও জন্তুজানোয়ারের চিত্রগুলি পাহাড়ের গুহায় এঁকে রেখে গিয়েছে। আজ পর্ব্বতের গুহায় তারা মূক হয়ে থাকলেও, তাদের সেই কামনার ইঙ্গিত বা সংঘ-আবেগের স্পন্দন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, অস্বীকার করা যায় না।

তারপর ব্রতকথা। ব্রত হোচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্ম্মবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের নয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা থাকত, সেইগুলিকে বাধা দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। একজন মানুষের ইচ্ছা বা কামনা চরিতার্থতার জন্যে ক্রিয়াকে ব্রত বোলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের উৎস হোচ্ছে কামনায় এবং কামনা-চরিতার্থতার জন্যে ক্রিয়ায়, তাহোলেও ব্রত তখনই হবে যখন দশজনে মিলিত হয়ে এক কাজ একই উদ্দেশ্যে করবে। একের সঙ্গে অন্য দশজনে মিলছে কারণ এই মিলনের পরিপন্থী তৎকালীন

---

* "The chief artistic feature of these Raigarh paintings lies in their spirited expression and spontaneity of treatment. A strong family likeness may be noticed between these cave paintings and the patterns on what is called the 'crosslined' pottery of pre-historic Egypt. In these the men are represented in the 'triangular style,' a method of drawing adopted by many primitive races..."—*Notes on the Pre-historic Cave Paintings at Raigarh*—By Percy Brown. Appendix to Chap. VIII, *Pre-historic India*, By Panchanan Mittra. P. 458.

সমাজ ছিল না। এখনকার উপাসনার সঙ্গে তাই ব্রতের আকাশ-মাটি ব্যবধান। দু'য়ের উৎপত্তি কামনা ও কামনা চরিতার্থতার জন্যে ক্রিয়া থেকে, কিন্তু উপাসনা একের মধ্যে আবদ্ধ, তাই উপাসনাতেই তার শেষ, এবং ব্রত দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাই কামনার চরিতার্থতায় তার বিকাশ। বেদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই জলের এক দেবতা, আগুনের এক দেবতা, বৃষ্টির এক দেবতা, এমনকি মণ্ডুক পর্য্যন্ত, যেমন দেখতে পাই পৃথিবীর নানাস্থানের মানুষের মধ্যে। পার্থক্য শুধু নামের। বেদের সূর্য্য ঈজিপ্তে 'রা' বা 'রাআ', মেক্সিকোতে 'রায়মী', বাংলায় 'রায়' বা 'রাঈ'। নানাধাতুর মধ্য দিয়ে নানা ঘটনা মানুষের অন্তরকে আলোড়িত করেছে, এবং প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্তে না থাকার দরুণ, সেইসব ঘটনার মূলে নানারকম দেবতা অপদেবতা কল্পনা কোরে নিয়ে তারা শস্যকামনা, সৌভাগ্যকামনা চরিতার্থ করবার জন্যে ব্রত করেছে। অনার্য্যরা তো করেছেই, এবং ঋগ্বেদ-এর স্তোত্রগুলিতেও এই কামনা দেখা যায়। যেমন মণ্ডুক-স্তুতি"—ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা-ঋতুতে) মণ্ডুকগণ অপরিমিত গো-প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন।" * এর থেকেই বোঝা যায় যে বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালেই রচিত হয়েছিল, এবং অধ্যাপক জেকোবী প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ সালের পূর্ব্বে স্থান দিতেও অসম্মত নন। কোনো বিশিষ্ট শ্রেণী বা জাতের রচনা বেদ নয়, আর্য্যদের তো নয়ই। সেইজন্য প্রাগার্য্যদের ব্রত বা সঙ্গীত-প্রার্থনার সঙ্গে তার মিল আছে। আর্য্যেরা অবশ্য ভারতবর্ষে এসে প্রাগার্য্যদের 'অন্য-ব্রত' বোলে আহ্বান করলেন, কিন্তু আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বেও যে এ-দেশে মানুষ বসবাস করছিল এটাও ঠিক। বাইরে থেকে আর্য্যেরা এসে যে তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানও করেছিলেন, পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ আসল ব্রত-

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

গুলিকে শাস্ত্রের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে প্রাণহীন কোরে বেঁধে ফেলেছেন। কোথাও তাঁরা পুরানো অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলিকে রূপান্তর কোরে শাস্ত্রীয় বোলে চালাবার চেষ্টা করলেন, আবার কতকগুলি নূতন নূতন নিজেদের মনগড়া ব্রত সৃষ্টি করলেন, যেমন দধি-সংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্ব-সংক্রান্তি ইত্যাদি। এগুলি কেবল নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভে ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করেছে, উদ্দেশ্য হোচ্ছে শ্রেণী-প্রভুত্ব বজায় রেখে পায়ের উপর পা দিয়ে শোষণ কোরে পুষ্ট হওয়া। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলাদান, সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন, ঘৃতদাড়িম্ব বিশেষ বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দান করলে পুণ্য হয়, এ-ছাড়া এই ব্রতগুলির আর দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'আদর-সিংহাসন' ব্রত বোলে একটি প্রাচীন অশাস্ত্রীয় ব্রত ছিল। স্বামীর সোহাগ কামনা কোরে এই ব্রত খুব প্রচলিত দেখে ব্রাহ্মণেরা 'ব্রাহ্মণাদর' বোলে একটি ব্রত সৃষ্টি করলেন—"মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন এক এক অথবা একই ব্রাহ্মণকে নানা উপকরণে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। চারিবৎসরে উদ্‌যাপন।" ঠিক তেমনি মধুসংক্রান্তি ব্রত মেয়েরা শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবন কামনা কোরে করছে দেখে ব্রাহ্মণেরা—"ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত সহ লড্ডুক দান কর" বোলে তাকে আয়ত্তে এনেছেন।

কিন্তু এ-দেশের ব্রতগুলি আসলে যে ব্রাহ্মণের নয়, হিন্দুর নয়, মানুষের সাধারণ কামনার অভিব্যক্তি তা পূর্ব্বেই বলেছি। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে শস্‌পাতার ব্রতের বা 'ভাঁজো'র। বর্দ্ধমান অঞ্চলের মেয়েরা ভাদ্র মাসের মন্থন-ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ কোরে এই ব্রত পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ করত। মন্থন ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পাঁচরকমের শস্য—মটর, অরহর, কলাই, ছোলা, মুগ—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে আর ইঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নূতন সরাতে রাখা হয়। দ্বাদশী পর্য্যন্ত মেয়েরা প্রতিদিন স্নান করবার সময় এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে যায়। চারপাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হোতে থাকে তখন বোঝা যায় যে তাদের প্রচুর শস্যের কামনা চরিতার্থ

হবে এবং তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করা হয়। চাঁদের আলোতে উঠানের মধ্যে এই উৎসব। নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্র-চিহ্ন দেওয়া আল্‌পনা। বেদীর চারিদিকে মেয়েরা শস্‌পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তারপর একসঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে নৃত্য সুরু করে। উঠানে বাদ্যকার তাল দিতে থাকে—

ভাঁজো লো কল্‌কলানী, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চ ফুলের মালা।
এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘী,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি?

তারপর দুইদলে ভাগ হয়ে মুখে-মুখে ছড়া-কাটাকাটি—

পূর্ণিমার চাঁদ হেরে তেঁতুল হলেন বঙ্ক!
গড়ের গুগ্‌লি বলে—আমি হব শঙ্খ!
ওগো ভাঁজো তুমি কিসের গরব কর?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার!

সারারাত্রি নাচগানের পর চাঁদের আলো আর তারার ঝিকিমিকি দেখে সুন্দর বর্ণনা—

ষোল ষোল বর্ত্তির হাতে ষোল সরা দিয়া
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

তারপর রাত্রি শেষ। ভোর। আপম আপন শস্‌পাতার সরা মাথায় নিয়ে মেয়েরা পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে। শস্যের উদ্‌গম কামনা কোরে সরাতে শস্যবপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হয়ে ব্রত শেষ হোলো নৃত্যগীতে, এবং বিসর্জ্জনের পর পুরুষদের মহানন্দে কার্য্যারম্ভে।

এই ব্রতের সঙ্গে যে পৃথিবীর নরনারীর ব্রত বা উৎসবের যোগাযোগ ও সাদৃশ্য রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়, এবং এটা অনার্য্যদের ব্রত তাতেও সন্দেহ থাকে না, কারণ সরাতে এই শস্য উদ্‌গম থেকে আরম্ভ

কোরে বিসর্জন পর্য্যন্ত উৎসব, বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী জেম্‌স্ ফ্রেজার বর্ণিত প্রাচীন মানুষের 'এ্যাডোনিস্-এর বাগান' উৎসব (Garden of Adonis) ভিন্ন কিছুই নয়।* ফ্রেজার সাহেব এ-দেশের ওরাও ও মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত এমনি একটি উৎসবের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ধান বপনের সময় এলে এদের যুবকযুবতীরা একসঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে 'কর্ম্মবৃক্ষ' বা তার শাখা একটি কেটে নিয়ে আসে। গান গেয়ে সেই শাখাটিকে গ্রামের মধ্যে পুঁতে দিয়ে তাকে ঘিরে সকলে নাচতে থাকে। শাখাটিকে পূজা করা হয়, এবং পরদিন হাত ধরাধরি কোরে ওরাও-মুণ্ডা যুবকযুবতীরা নাচে। খড়ের নকল গহনা দিয়ে গাছটিকে সাজান হয়। উৎসবের জন্যে গ্রামের মোড়লদের মেয়েরা শস্যের বীজ বপন কোরে রাখে এবং কয়েকদিন পরে সেগুলি অঙ্কুরিত হোলে শাখাটির কাছে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে' রোপণ কোরে দেয়। তারপর সেই শাখাটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে। বৃক্ষকে এরা শস্য উদ্‌গমের প্রধান সহায় বোলে ভাবে, সুতরাং এ-উৎসবের সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করা চলে না, মেনে নিতে হয় যে এটা এ্যাডোনিস্-এর বাগান-উৎসব। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই উৎসব নৃত্যগীতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এবং উৎসবের উদ্দেশ্যও সর্ব্বত্রই এক।

উপরে যে শস্‌পাতার ব্রতের বর্ণনা করা হয়েছে তার সঙ্গে একটি শাস্ত্রীয় ব্রতের তুলনা করলে বোঝা যাবে যে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মানুষের [illegible] সুন্দর উৎসবগুলিকে কতো প্রাণহীন করেছেন। যেমন 'হরিচরণ ব্রত'। বছরের প্রথম মাসে অল্পবয়স্কা বালিকারা এই ব্রত করছে, চন্দন দিয়ে তামার টাটে

*"Perhaps the best proof that Adonis was a deity of vegetation, and especially of the corn, is furnished by the gardens of Adonis, as they were called. These were baskets or pots filled with earth, in which wheat, barley, lettuces, fennel, and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, *chiefly* or *exclusively by women*... The rapid growth of the wheat and barley in the gardens of Adonis was intended to make the corn shoot up; and the throwing of the gardens and of the images into the water was a charm to secure a due supply of fertilizing rain." (The Golden Bough Part VI, By James G. Frazer—"Adonis, Attis, Osiris"—Book I.)

হরিপাদপদ্ম লিখে। এই ব্রতে ছোটমেয়েদের প্রাণের আনন্দ, মুখের সহজ কথা পর্য্যন্ত নেই। এমনকি প্রাণখুলে তাদেরই মতো সুন্দর সুন্দর আশা বা কামনা করবারও ক্ষমতা তাদের নেই। এই শাস্ত্রীয় ব্রতটির মধ্যে বালিকার মুখ দিয়ে দুর্ব্বোধ্য পাকা পাকা জ্যাঠামিতে ভরা কথা বলানো ভিন্ন আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। হরির পাদপদ্মে পূজা দিয়ে পাঁচ-ছ' বছরের ছোট ছোট বালিকারা চাইছে—গিরিরাজ বাপ, মেনকার মতো মা, রাজা 'সোয়ামি', সভা-উজ্জ্বল জামাই, গুণবতী বৌ, রূপবতী ঝি, লক্ষণ দেবর, দুর্গার আদর—"দাস চান্, দাসী চান্, রূপার খাটে পা মেল্‌তে চান, সিঁতের সিঁদুর মুখে পান, বছর-বছর পুত্র চান্।" আর চান—"পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে একগলা গঙ্গাজলে মরণ এবং উষোতে পারলে ইন্দ্রের শচীপনা, না পাল্লে কৃষ্ণের দাসীগিরি"। সর্ব্বনাশ নয় কি? এই যে ছোট ছোট বালিকারা হরিচরণ ব্রত করছে, আর যে তরুণতরুণীরা নৃত্যগীতে শস্যের প্রাচুর্য্যের ও জীবনের উৎসব করছে একত্রে, এই দুই দলে কি ভীষণ পার্থক্য! একদল হিন্দুশাস্ত্রকারদের কৃপায় ও শুভেচ্ছায় একগলা গঙ্গাজলেই আত্মহত্যা করতে উদ্যত বালিকাবয়সে, আর একদল বিশ্বচরাচরের সঙ্গে চাঁদের কিরণে, ভোরের সূর্য্যের আলোতে কচি কচি শ্যামল ফলফুলে ভরা ক্ষেতের মতো জেগে ওঠবার জন্যে, আনন্দের জন্যে, বাঁচবার জন্যে উল্লাসে উদ্‌গ্রীব! মানব-সংস্কৃতি আর শাস্ত্রীয় বা শ্রেণী-সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যও ঠিক এতখানি।

এইভাবে শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর প্রাগেতিহাস ও ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায় যে যারা অস্ত্র নিয়ে শ্রম করেছে, যন্ত্র চালিয়েছে বা জমি চষেছে তাদেরই গতিশীল ছন্দোময় জীবনের আঘাতে সাংস্কৃতিক প্রগতি, বিজ্ঞানে ও শিল্পে, সম্ভব হয়েছে। এই গতিশীলতা মানব-চেতনার অংশ, তাকে বিচ্ছিন্ন কোরে অন্য চিন্তা অসম্ভব। আদিম যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ ও অসাম্য বেশী ছিল বোলে কতকগুলি স্থির, অচঞ্চল প্রত্যয়কে তাদের আঁকড়ে ধরে থাকতে হোত, যদিও তার পশ্চাতে ছিল অবিরাম গতির আবেগ। নবোপলীয় যুগে কৃষিকাজের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যখন হোলো তখন কতকগুলি বেগবান প্রতীক মানুষ সৃষ্টি করল। মালিকানা-প্রথা ও শ্রেণী-সমাজের

আবির্ভাবের ফলে মানুষের অধিকারের বৈষম্য ও ভেদ ক্রমেই দৃঢ় হোতে রইল, এবং বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী প্রয়াস পেল প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংপৃক্ত হোতে। এখানে কিন্তু চক্রাবর্ত্তন হোলো না, কারণ 'আদিম' সংঘ-সমাজে মানুষ প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। বিশ্ব-সাম্যবাদে যে বিশাল মানব-সমাজ গড়ে' উঠবে তার শক্তিও বিরাট। জুপীটার, ভল্‌কান, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা আজ বিজ্ঞানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বীক্ষণাগারে ও কারখানায় বন্দী। যন্ত্র আজ জাদুর কাজ করছে। সুতরাং আজ যে সংঘ-সমাজ মানুষ গড়বে তার রূপ অতুলনীয় এবং সে-সমাজ মানুষের অনিরুদ্ধ চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী হবে।

এ-যুগে দেখা যায় একদিকে সৃষ্টি ও গঠনের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে জনগণ শান্তি ও প্রাচুর্য্যের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম-বন্ধুর পথে অগ্রসর হোচ্ছে, আর একদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিব সমরতন্ত্র ও শোষণ-নীতির শাসানি। সংগ্রামরত রয়েছে গতিশীল গণশক্তি। ধনতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত শক্তির বিকাশ হোচ্ছে নরহত্যায় ও ধ্বংসলীলায়, কিন্তু ব্যর্থতার অবসন্ন চিন্তায় জনগণ কাতর নয়, নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় ও প্রয়াসে তারা বদ্ধপরিকর। আজ জরাগ্রস্ত সংস্কৃতিব যে দুর্গন্ধ তাদের বিষাক্ত করছে, সেই সংস্কৃতিকে বেগবান, প্রাণবন্ত রূপ দেবার জন্যে তাদের বিরাম নেই। ইতিমধ্যে সেই শক্তির প্রকাশ শুধু সম্মিলিত সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট্ রিপাবলিকগুলিতেই হয়নি, দুর্গম মেরু অঞ্চলে, এবং পৃথিবীব্যাপী লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের পুনরাবির্ভাবের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষেও আজ তাই বাউল গান আর পটশিল্পের এতো সম্মান, এমন কি লোক-নৃত্যও পুনর্জীবিত হোচ্ছে। বোঝা যায় গণশক্তি বিরামহীন গতিতে সক্রিয় রয়েছে। এ-ছাড়া এর আর অন্য কোনো যুক্তি নেই। বহুদিনের শৃঙ্খলিত সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলির বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। সেগুলি চূর্ণ হয়ে প্রচণ্ড বেগবান প্রতীকে রূপান্তরিত হবে। সংস্কৃতির এই রূপান্তর পরিপূর্ণ ঘটবে বিশ্ব-সাম্যবাদী সমাজে, এবং অনিবার্য্য ঐতিহাসিক নিয়মে সেই প্রাগার্য্যযুগের মতো ভারতবর্ষ আজও শ্রেণী-সীমান্ত-শূন্য মানব-সমাজের সভ্য হবে।